মুক্তির পথ

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

রাম নারায়ণ রাম

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ-
শ্রী কমল চক্রবর্ত্তী, অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৮
২৫শে জুন, ২০১১

মুদ্রণ
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

বিঃদ্রঃ- পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ উপনয়ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, বাং ১৩৪০ সালের ১২ই আষাঢ়, সোমবার, ইং ২৬শে জুন, ১৯৩৩ সালে। সকাল ৬-১৩ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত শুভ তিথির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতুলালয় দোগাছিতে শাস্ত্র মতে এই শুভ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতুল (মেজ) পণ্ডিত হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ, তাঁর আচার্যগুরু হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সমস্ত উৎসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু ভক্ত-শিষ্যদের একান্ত আগ্রহে অনেক কিছুতেই তাঁকে সম্মতি দিতে হয়। ঘটনাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত-শিষ্যরা শুভ উপনয়ন (পৈতা) দিবস উপলক্ষ্যে বাং ১০ই আষাড় দিবসটি, অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে পালন করে আসছে।

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
infoavinabadarshan@gmail.com
Website : www.avinabadarshan.com (Free Download)

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য ঃ- দশ টাকা মাত্র

পূর্বাভাষ

জীব মুক্ত হয়েই পৃথিবীতে আসে। কেন না আলো জল বাতাসের মতো মুক্ত বস্তু হতেই সবার সৃষ্টি। তাই সবাই মুক্ত। মুক্ত জীবকে পাপ বা পুণ্য কোনটাই স্পর্শ করতে পারে না। এখানে পাপ বা পুণ্য যার যার মনের ব্যাপার। আমাদের মনের অবস্থা অনুযায়ী যে কর্মগুলি আমরা করি, তার ফলস্বরূপ পাপ বা পুণ্য যেমন বিচার করি, তেমনি বিবেকবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে কাজকর্ম করে মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে পারি।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা যে যা করছি, বেশীরভাগ দেখেশুনে বুঝেই করছি। সংসারের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে, যশ মোহ প্রভাব-পতিপত্তির লোভে, অহঙ্কারের নেশায় সুখের ঘর তৈরী করতে গিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে দুঃখকে বরণ করছি। সেই দুঃখ শ্মশানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত থেকেই যাচ্ছে। আর এত দুঃখের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে ধর্মের উন্মাদনার উন্মত্ততায় একটু সুখের জন্য, মুক্তির জন্য মঠ মন্দির মসজিদ গীর্জায় গিয়ে ভোগের ডালা সাজাচ্ছি আর মাথা ঠুকছি।

আমাদের কত প্রিয়জন, কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন চলে গেছেন। তাদের সাথে আমাদের আর দেখা হচ্ছে না। তারা কত আশা-আকাঙ্খা নিয়ে আমাদের মতো ঘর সংসার বেঁধে ছিলেন। কিন্তু আজ ঘরবাড়ী সব ফেলে রেখে চলে গেছেন। এখানে একটু শান্তির জন্য, একটু তৃপ্তির জন্য কি না করেছেন তারা। ঠিক একই ভাবে আমরা সবাই তৃপ্তির পিছনে ছুটছি। মরুভূমিতে গেলে তৃষ্ণার্ত্ত মানুষ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কেবল জলের সন্ধানে ছোটে। তারপর জল না পেয়ে মরুভূমির সেই তপ্ত বালিতেই জীবন বিসর্জন দেয়। আজ আমরা সেইভাবেই ছুটছি তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। কিন্তু এই তৃষ্ণা আমাদের কিছুতেই মিটবে না, যতক্ষণ না আমরা আসল তৃষ্ণার সাথে যুক্ত হচ্ছি। আজ আমরা প্রত্যেকেই আসল বস্তু ফেলে দিয়ে ছুটছি সাময়িক তৃপ্তির পিছনে মুক্তির সন্ধানে।

বর্ত্তমানে প্রচলিত তথাকথিত সংস্কারগত ধর্মের নামে একশ্রেণীর সাধু গুরু মহান নামধারী ব্যক্তিরা নানাভাবে সমাজকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। ধর্মের প্রকৃত অর্থ তারা নিজেরাও বোঝেনি, আর অন্যকেও বুঝাতে পারছে না। আত্মা, ইহকাল, পরকাল, কর্মফল, প্রায়শ্চিত্ত, পাপ-পুণ্য, মুক্তি ইত্যাদির গোলোক ধাঁধাঁয় পড়ে তারা নিজেরাও হাবুডুবু খাচ্ছে আর গোটা সমাজটাকে করছে বিভ্রান্ত। এদের কথার (তথাকথিত শাস্ত্রের ব্যাখ্যার) প্যাঁচে যারা পরেছে, গোলোকধাঁধাঁয় ঘুরে তারা মরেছে।

সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আজ আমরা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছি। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা। তাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের দ্বারাই একমাত্র মুক্তি সম্ভব। আমাদের মনে কত কি আসছে, যাচ্ছে। চারদিক হতে ছল চাতুরী ঘিরে ধরছে। এসবের হাত থেকে কি করে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে?

বেদ (প্রকৃত জ্ঞান) বলছেন, ‘‘মনের মাঝে যা কিছু আসছে, আসতে দাও। আগে যা কিছু করেছ, ভুলে যাও। নূতনভাবে নিজেকে পরিবর্তন করো। সমস্ত ক্লেদ পঙ্কিলতাকে ফেলে দিয়ে তুমি তোমার কাজ করে যাও। এগুলোর জন্য ভাবতে হবে না। তোমরা অনুভূতির রাজত্বে আছ। নূতন করে কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না। যে বীজ তোমাদের মধ্যে আছে, তাই দেহক্ষেত্রে পুঁতে দাও। আপনি অজস্র বীজ তৈরী হয়ে আসবে। আর বীজ একবার ফুটতে আরম্ভ করলে তখন সব বুঝতে পারবে কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য, কোথায় ছিলে, কেন এসেছ? কোথায় যাবে? জানতে কোন অসুবিধা হবে না। তখন কারোর আদেশ নির্দেশ উপদেশের প্রয়োজন হবে না।’’ সুতরাং জীবনে চলার পথে বেদই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির পথ।

সংস্কারের ঘূর্ণীপাকের চক্র থেকে জীবকে আলোর পথ, মুক্তির পথ দেখাতে পারেন একমাত্র জন্মসিদ্ধ মহান। তাঁরা জীবের অন্তরে আনন্দের জোয়ার জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। তাঁরা সাধারণের সাথে মিশে সাধারণভাবে তাঁদের কাজ করে যান। বাস্তবের কোন অবস্থাই তাঁদের সম্পূর্ণভাবে স্পর্শ করতে পারে না। যদিও সব সময়েই বাস্তবের সর্ব অবস্থার মধ্যে তাঁরা বিরাজমান।

জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের বেড়াজাল হতে জীবের উদ্ধারকল্পে, জীবকে মুক্তির পথের সন্ধান দিতে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **“অভিনব দর্শন”** প্রকাশনের উপর তিনি অপর্ণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে অভিনব দর্শন প্রকাশনের ৩৭-তম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো, **মুক্তির পথ**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৮ — *চপল মিত্র*

২৫শে জুন, ২০১১ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

মুক্তির পথের পথিক তোমরা। তোমরা সবাই মুক্ত। মুক্ত জীবকে পাপ বা পুণ্য কোনটাই স্পর্শ করতে পারে না।

২৮, ল্যান্সডাউন টেরেস, কলিকাতা
২৩শে জুলাই, ১৯৬৭

(বেদমন্ত্র...)। তোমাদের মুক্তির দরজা যে খোলা। সেই মুক্ত বস্তু দিয়ে তৈরী হয়ে যখন এসেছ, তোমরা সবাই মুক্ত। পাপ বা পুণ্য, এটা বাইরের জিনিস। মুক্ত জীবকে পাপ বা পুণ্য, কোনটাই স্পর্শ করতে পারে না। তোমরা তার চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে। কি রকম? সাগরের জল আর বাতাসের জল, দুটোই জল। সাগরের জলে ডুবলে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আর সেই জল যখন বাতাসে থাকে শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করে। অনেকে বলে, ডুবলে (অন্যায় আচরণ করলে) পাপে ধরে। এটা যার যার নিজস্ব ব্যাপার। তোমাদের গতি ডুব দেওয়া নয়। তোমাদের কাজ হচ্ছে মুক্ত জায়গায় বিচরণ করা।

সাগরের রূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সাগর একদিকে নিম্নে; আর একদিকে ঊর্দ্ধে। সেখানেও নীল আকাশে সাগর আছে। ঊর্দ্ধে থেকে দান করা যায়। নিম্নে থেকে তো আর দান করা যায় না। এক শ্রেণীর ব্যক্তি শাস্ত্রকে বিকৃত করার ফলে সমাজ আজ বিভ্রান্ত। ''এই যে পাপ পঙ্কিলতা নানাভাবে আমাদের ঘিরে ধরেছে, যার ফলে ভগবানের দর্শন বা তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারা যাচ্ছে না'', এই কথা বললে বিরাট পুরুষকে (স্রষ্টাকে) অবমাননা করা হয়। তাঁর দান যখন রয়েছে, তাঁর দেওয়া বস্তু যখন রয়েছে, তোমরা সহজেই

মুক্ত জায়গায় বিচরণ করতে পারবে। তোমাদের গতিও মুক্ত জায়গায়। কারণ তোমরা তৈরী সেই মুক্ত বস্তু দিয়েই।

তোমাদের পাপেরও দরকার নাই, পুণ্যেরও দরকার নাই। তোমরা পৃথিবীর গর্ভজাত সন্তান। পৃথিবীর গতিতে নীচু ও নাই, উপরও নাই, এদিকও নাই, ওদিকও নাই। সবদিক তার সমান। সেখান হতেই তো তোমরা এসেছ। সুতরাং তোমাদেরও ওঠা নামার কোন প্রশ্ন আসছে না। এতবড় শাস্ত্র, এতবড় বেদ অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মাঝে। তারই ধ্বনি, প্রকৃতির ধ্বনি, বেদধ্বনি— সেই ধ্বনিতে চিরযোগে যুক্ত হয়ে রয়েছ তোমরা। তোমরা উপরে উঠেছ, এটা যেমন ভুল, তোমরা নীচুতে নেমেছ, এটাও ভুল। অযথা এসব কথা বলার কি দরকার আছে? তিনি (প্রকৃতি) বলছেন, তোমরা স্থান ভ্রষ্ট হও নাই। **এই বিশ্বের যে জায়গায়ই থাক, আমি তোমাদের এমন একটা স্থানে রেখেছি, সেটাই তোমাদের কাছে চরম স্থান।**

তুমি কোথায় আছ? তোমরা কোথায় আছ? তোমরা পৃথিবী হতে দূরে সরে যাওনি। উপরেও সরে যাওনি, নীচেও সরে যাওনি। এই অনন্ত গতির মাঝে গতিময় হয়েই তোমরা চলেছ। এতবড় শাস্ত্র, এতবড় বেদ— তার অর্থ করলে দেখবে, তোমরা এমন একটি অবস্থায় রয়েছ, এমন একটি সমসুরে রয়েছ, যেখানে ওঠানামার কোন প্রশ্ন নাই। নীচেও যখন যাচ্ছ না, উপরেও যখন উঠছো না, তবে তোমরা কোথায়? কোন্ স্থানে তোমরা রয়েছ? তোমরা সেই বিরাট সত্তায় রয়েছ, মুক্ত জায়গায় রয়েছ। এদিক সমান, ওদিক সমান, সবদিক যার সমান, এতবড় সাম্যের স্থান, এতবড় স্বর্গ আর কোথায়? **এতবড় মহা স্বর্গে তোমরা এমনভাবে রয়েছ, যেখানে ওঠানামা নাই। প্রকৃতির স্বচ্ছ গতির মাঝে গতিময় হয়ে তোমরা**

রয়েছ। সেই স্বচ্ছ শক্তির বিষয় বস্তুদ্বারা তোমরা গঠিত। এখন যদি বলো, ''আমরা সেটা বুঝবো কি করে?''

প্রকৃতি বলছেন, বুঝেই যদি ফেলো, তবে আর বিরাট রইল কোথায়? তোমরা যদি বিরাটকে বুঝে নাও, তবে 'বিরাট' কথাটি থাকবে কি করে? এতবড় বিরাট, ভাষায় যার ব্যাখ্যা করা যায় না, সেই বিরাটের ব্যাখ্যা তোমরা করছো কি ভাবে? অতি তাচ্ছিল্যের সুরে। এতবড় বিরাটকে কিছুই বুঝতে না পেরে তোমরা কি করলে? তাকে 'শূন্যে' দিয়ে দিলে। শূন্যে পৃথিবীগুলি উড়ছে ধুলার মতন। ধুলা বললেও যেন বড় হয়ে যায়। পৃথিবীর ঝড় বইতে থাকে এই শূন্যে। বিরাট বিরাট মরুভূমিতে যেমন ধুলার ঝড় হয়। মহাশূন্যে সেইরূপ পৃথিবীর ঝড় হয়।

নামবিহীন অবস্থায় সব গ্রহগুলি ঘুরছে মহাশূন্যে। নাম দিলেও তাকে স্থান দেওয়া যায় না। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই হল পৃথিবীর অবস্থা। তার মধ্যে আমরা। ''পৃথিবীর বুঝটাই বুঝিস না। তুই আবার বিরাটকে বুঝবি কি? সূর্য তো অনেক বড়।''

এক ভক্ত এসেছে শিবের কাছে বিরাটকে বুঝতে। শিব বলছেন্ 'তুই বুঝতে এসেছিস্?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভু।

শিব তাকে স্পুটনিকের মতো ছুঁড়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একবছর পর সে ঘুরে আবার শিবের কাছে এসেছে।

শিব বলেন, 'কিরে, কি বুঝছোস্?'

সে বলে, প্রভু, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র সব তো আমার মতই ঘুরছে।

—তবে এটাই বুঝেছিস্?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে বসে থাক। তখন শিব তাকে দীক্ষা দিলেন। সে আবার বলে, ''বাবা, কিছুই বুঝা যায় না।'' শিব বলেন, এটা এমন জায়গা, তুই এমন জায়গায় আছিস্, যেখানে কিছুই বুঝা যায় না। এই হল একটা ব্যাখ্যা।

ভক্তের রক্ত মাংস, শিরা উপশিরা হ'তে কি কথা বের হ'ল? ''বাবা, কিছুই বুঝা যায় না।''

শিব বলেন, ''তবে এই কথাই বল। ভাষাতীত, ভাবাতীত, ব্যাখ্যাতীত, এই জাতীয় কথা বলিস্ না। এই ভাষাটাই শিখে নে। আর পৃথিবীর সাথে উড়তে থাক।''

সে আবার ঘুরছে। পৃথিবীর সাথে সাথে মহাশূন্যে উড়ছে। বারো বছর পর আবার শিবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভক্ত বলে, ''প্রভু, সূর্য, চন্দ্র, যতগুলি গ্রহ আছে, সবাই তো দেখছি, আমার মতই ঘুরছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সমস্ত সূর্যটাই আমি।''

শিব বলেন, ভালই তো বলেছিস্। বাপের মতনই ছেলে হয়। মুখের অনেকটা মিলতি থাকে। তুই তো বীজ। তোকে অমুকের ছেলে বললে ভুল হবে। তুই তো বীজ।

—হ্যাঁ, তাই তো। আমি তো সূর্য হয়ে যাই। চন্দ্র হয়ে যাই। আকাশ, বাতাস সব হয়ে যাই, প্রভু।

শিব— তাই যদি হয়ে যাস্, তবে আর বাধা কি? তাহলে তুই এই ধ্যানই কর।

ভক্ত সেই ধ্যানই করছে, ''আমি আকাশ, আমি বাতাস, আমি সূর্য, আমি চন্দ্র।''

কতদিন পরে সে শিবকে বলে, ''প্রভু, আমি বুঝছি, আমি গলে গেছি।''

—গলে গেছিস্? তাহলে তুই মিশে গেছিস্। তোর পাপও নাই, পুণ্যও নাই। তখন ভক্ত ভকত হেসে দিয়েছে।

এক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছে। ত্রিশটা পদ রান্না করেছে। কিন্তু খাওয়ার শেষে মুখশুদ্ধি দেয় নাই। একটা এলাচির দানা দিতে ভুল হয়ে গেছে। তাতেই নিমন্ত্রিতরা চটে গেছে। সেই ব্যক্তি গলবস্ত্র হয়ে খাইয়েছে। ''খান খান'', বলে আপ্যায়ন করেছে। শুধু ভুলে গেছে একটা এলাচির দানা দিতে।

আমাদের দেশের রাগ তো জান। যাওয়ার সময় বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিন্দা করতে করতে গেছে, ''আমাদের অপমান করেছে। মুখশুদ্ধি দেয় নাই।'' সেই ব্যক্তি আবার বিশেষ অনুরোধ করে তাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছে। এবার তাদের প্রত্যেকের সামনে এক গ্লাস জল আর এক থালা করে এলাচির দানা দিয়েছে।

—এগুলি কি দিয়েছ? এত কেন?

—আজ্ঞে, বেশী দিলে আপনারা যদি খুশী হন। আমি তো এক-সের করে এলাচির দানা দিয়েছি। পেট ভরে খান।

—এতে কি পেট ভরে?

—আজ্ঞে, এরজন্যেই তো আপনারা রাগ করলেন। 'আমি আপনাদের অপমান করেছি', বললেন। খুশীচিত্তে পেট ভরে খান।

দেখা গেল, **এলাচির দানা দিয়ে পেট ভরে না। সংসারে আমরা এই দানা নিয়েই ঝগড়া করছি। স্রষ্টা তাঁর সব কিছু ঢেলে দিয়ে আমাদের সাজিয়েছেন। আর আমরা লবঙ্গের মত সামান্য বস্তু নিয়ে ঝগড়া করে চলেছি।**

এখানে পাপ-পূণ্য নিয়ে শাস্ত্র চলছে। 'কাম ছাড়', 'ক্রোধ ছাড়', 'লোভ ছাড়', 'মোহ ছাড়'— এগুলি তো সব এলাচির দানা।

তোমার সাময়িক ক্রোধে, সাময়িক লোভে দেবতার কি আসে যায়? তুমি তো ঊর্দ্ধমুখী, আকাশমুখী হয়ে রয়েছ। বৃষ্টির জলে পৃথিবী ভরে গেছে। জলে দেশ ডুবে গেছে। জল যাবে কোথায়? জল তো পৃথিবীর গায়ে গায়েই গড়াগড়ি করছে। একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়। **প্রকৃতি বলছেন, ''তোমার মধ্যে যে সত্তা রয়েছে, সেটা নিয়েই থাক। তোমার ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি আমি দান করলাম। তুমি এর মধ্যে কারিকুরি করতে গিয়েছ কেন? খোদার উপরে খোদকারি করার প্রয়োজন কি? তোমার তো কিছু করার দরকার নাই।** আমি যা দিয়েছি, তাই নিয়েই বসে থাকো। আমি যেই যেই বিষয়বস্তু দিয়ে দেহবীণাযন্ত্রকে গড়েছি, তারপর চামড়া দিয়ে আটকিয়ে রেখেছি। তোমার এতে ছাড়াছাড়ির কি আছে?''

বেদ তো বলে নাই, 'কাম ছাড়', 'ক্রোধ ছাড়'। বেদ বলছে, আমি তোমাদের ভরপুর করে দিলাম। তোমাদের মাথার উপরে আকাশ। ডাইনে আকাশ, বামে আকাশ, পায়ের তলে আকাশ। সেই আকাশের মধ্যে যখন রয়েছ, তোমাদের চিন্তাও তো সেইরূপ বিরাট হবে। তোমাদের মন তো সেইরূপ আকাশের মতো হবে। মন তো কৃষ্ণ, মন তো ভগবান, মন তো শিব। আবার সেই মনের ভিতর শিব এনে বসানোর কি প্রয়োজন? যদি কেউ এসে বলে, 'এই কর', 'তাই কর', সেকথা শুনে চলবে কেন? বেদ কি তাই বলেছে? তোমরা বেদের কথাই যদি স্বীকার কর, তবে সেইমতে চলবে। মোটা সুতা থেকেই ফাইন সুতা হয়, ফাইন কাপড় হয়। ঢাকার মসলিন শাড়ী একটা দেশলাইয়ের বাক্সে ঢুকিয়ে রাখা যেত। ফাইন জিনিস, সুন্দর জিনিস সুন্দরভাবে রাখতে হয়।

এই মুক্ত জায়গায় মুক্ত অবস্থায় মুক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা তোমরা

তৈরী। তোমাদের কি করতে হবে? সূর্য যেমন বাঁচিয়ে রাখছে, এই জীবজগৎকে যেমন পালন করছে; এমন সুন্দর আলো, সূর্য উঠলে আকাশে কি সুন্দর দেখা যায়। এইসব বস্তু যে রয়েছে, কিসের জন্য? প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা নিশ্চিত অবস্থায় রয়েছ। দেহের মধ্যে যখন যা আসে, আসুক। তোমাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকতে বারণ করছে। কারণ তোমরা সাময়িকভাবে এখানে রয়েছ। কাজেই দুশ্চিন্তা কেন করবে?

আজকে চাল কিনছো সাড়ে তিন টাকা, চার টাকা কে.জি. দরে। যখন দুই টাকা, আড়াই টাকা মন চাল ছিল, সেই সময়কার মানুষগুলো কোথায়? তিন পয়সা সের দুধ খেয়েছে যারা, সেই লোকগুলো কি আছে এখনও? অথচ সেই গাভীও আছে, মানুষও আছে। চারিদিকে সবকিছু কেমন পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের পূর্বপুরুষরা কোথায়? তারাই তো খেয়েছে। তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধারাই তো বহন করছো তোমরা। মুর্শিদাবাদের নবাবের সেই আমই তো খাচ্ছ।

সবকিছু কেমন ছড়িয়ে যায়। পূর্বপুরুষরা তোমাদের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। জল যেমন বাষ্প হয়ে ছড়িয়ে যায়, বাতাস ছড়িয়ে যায়, ধোঁয়া ছড়িয়ে যায়। তারা ছড়িয়ে যায় কেন? সবসময় বৃহতের সাথে মিশতে চায়। তোমরাই বৃহৎ। **সূর্য যেমন আছে, এই পরিদৃশ্যমান জগতে আলো, তাপ বিতরণ করছে, তোমরাও অনন্ত কোটি অণুপরমাণুর সংমিশ্রণে বৃহতের সাথে মিশে বৃহৎ হয়েই রয়েছ।**

গুরু যখন আসেন, অবতার যখন আসেন, ভগবান যখন আসেন, তাঁরা কি করেন? তাঁর স্মরণ করিয়ে দেন। পৃথিবী প্রথমে উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। তারপর লক্ষ কোটি বছরের ব্যবধানে ধীরে

ধীরে যখন ঠাণ্ডা হল, গাছগাছড়া জন্মানো শুরু হয়ে গেল। শান্ত অবস্থা হলেই সৃষ্টি হবে। পারিপার্শ্বিকের চাপে উত্তপ্ত হয়েই তো রয়েছ তোমরা। তোমাদের মনকে একটু ঠাণ্ডা অবস্থায় আন। গাড়ীর ইঞ্জিন গরম হয়। আবার ইঞ্জিনের মধ্যে পিছনের দিকে পাখা ঘোরে। ভিতরের গরম বাতাসটা বের করে দেয়। একটা গরম করছে, আর একটা ঠাণ্ডা করছে। কাজেই উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

তোমাদের ভিতরেও ঐ দুটোই আছে। **গুরু এসে কি করেন? বলেন, বাপ্‌রে! তোমরা তো সিংহ। কিন্তু ভেড়ার দলে ভিড়ে ঘাস খাচ্ছ। তোমরা যে সিংহ ভুলে গেছ। তোমরা সিংহ হও।**

—আজ্ঞে, আমরা তো ভেড়া। কুকুর দেখলে পালিয়ে যাই।

তখন গুরু কি করলেন? তোমাদের ভিতরে সিংহত্ব জাগাবার জন্য একটু রক্তের স্বাদ দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ কানে বীজমন্ত্র দান করলেন। এখন বুঝতে পেরেছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তখন গুরু বলেন, তোমরা ভেড়ার দলে ছিলে তো। এখন ঐ ভেড়াগুলিরে মার। ভেড়া হচ্ছে সমস্যা। তোমাদের সংস্কারগুলো হচ্ছে ভেড়ামাফিক। **এতবড় ক্ষমতা তোমাদের, সেখানে পাপের কথা আনবে না। তোমাদের পাপ-পূণ্য, কোনটাই করার দরকার নাই। তোমাদের পুণ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন নাই।** দেবমন্দিরে গিয়ে ডালা দেবে কাকে? সে তো আমাদের মতনই একজন। যার কাছে পূজা দেবে, সে তো আমাদের মতনই। কার পূজা করছো? কার কাছে মাথা নত করছো? বিশ্ব স্রষ্টা সব কিছু তোমাদের সাজিয়ে দিয়েছেন। সঞ্চয় করতে গেলেই তোমাদের মধ্যে বৈষম্য এসে যাবে। তারতম্য এসে যাবে।

প্রকৃতি বলছেন, তোমাদের সবকিছু দিয়ে দিয়েছি। যা খেয়ে

বেঁচে আছ, সেটা আকাশের জিনিস। তোমরা নিম্নের জিনিস খাও না, ঊর্দ্ধের জিনিস খাও। যারা ঊর্দ্ধে থেকে খায়, যারা মহাশূন্য হতে পান করে, তারা মহাযোগে যুক্ত হয়ে রয়েছে। **তোমরা বিনা ত্রাটকে মহাত্রাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আলো পান করছো,বাতাস পান করছো। সেখানে মহা সুরের সাথে মিলিত হয়ে সুরের ধারা পান করছো।** গাছগুলো তাকিয়ে আছে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে। তারা মহাশূন্য হতে তাদের খাদ্য সঞ্চয় করে।

তোমরা কতবড় যোগী। দেখতো, দর্শনে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, স্বাদে, স্পর্শে (ত্বকে), ইড়া পিঙ্গলা, সুষুম্নায় ঊর্দ্ধের বস্তু পান করে চলেছ। এই যে পুকুরের জল পান করে। এটা নিম্নের জল নয়, ঊর্দ্ধেরই জল। বৃষ্টিধারার জলরাশিই সঞ্চিত হয়ে রয়েছে ভূগর্ভে। তাই নিম্নের যা কিছু বস্তু, সে যে ঊর্দ্ধেরই বস্তু। **তোমরা মহাযোগী। পূর্ণ বস্তু দ্বারা ভরপুর হয়ে রয়েছ। তোমাদের তো সঞ্চয়ের কোন দরকার নাই।** যারা শিবের সাধনা করে, মাতৃশক্তির আরাধনা করে, এটা কিসের ইঙ্গিত? শিবশক্তির মিলনই হচ্ছে প্রকৃতি পুরুষের মিলন; দেহবীণাযন্ত্রের সপ্তচক্রে আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারের মিলন।

এই জীবজগৎ মায়ার মধ্যে রয়েছে। 'আমি তোমায় ভালবাসি'। তুমি আমায় ভালবাস', এই কথাগুলি কি তুমি তৈরী করেছ? না, তোমাদের বাপ দাদাদের দান? স্নেহে মমতায় ভালবাসায় এই কথাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে অন্তর থেকে বের হয়ে এসেছে। **মাতৃশক্তি কতবড় শক্তি, জান? মহামায়ার মহা আকর্ষণের মধ্যে তোমরা রয়েছ। এই টানটা হচ্ছে মহামায়ার টান। মহামায়ার শক্তিই হচ্ছে আকর্ষণ, এইশক্তিই হচ্ছে যোগাযোগ। এই যোগাযোগে যুক্ত হয়েই মহাকাশে অনন্ত কোটি গ্রহ, নক্ষত্র পরস্পরকে আকর্ষণ করে মহাশূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এই আকর্ষণে যুক্ত হয়েই সংসারে আমরা**

পরস্পরের প্রতি স্নেহ, প্রেম, মমতায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছি।

মহামায়ার এই আকর্ষণ যে কি বিরাট, প্রতিমুহূর্ত্তেই বুঝিয়ে দিচ্ছে। তোমরা মাকে খুঁজে পাও, বাবাকে খুঁজে পাও, সন্তানকে খুঁজে পাও। সংসারে এই মা বাবা ভাই বোন, সন্তানের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির কত বড় ইঙ্গিত যে রয়েছে, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মহা বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ইঙ্গিত রয়ে গেছে এর মধ্যে। মা সন্তানের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়। মা সন্তানের জন্য পারে না, এমন কিছু নাই। স্নেহ মমতায় আপ্লুত হয়ে এই যে সন্তানের জন্য আত্মবিসর্জন দেবার প্রবণতা, এটা কোথাকার ইঙ্গিত?

বাবা পকেট মেরে টাকা এনে সন্তানকে খাওয়াচ্ছে। আমি দেখবো, সন্তানের জন্য পিতার স্নেহ কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে। বাবা পকেট মেরে টাকা আনতে গিয়ে মার খেয়েছে। জামা ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু সন্তানের জন্য আম কিনে এনেছে। ছেলেকে বলছে, 'নে বাবা, আম খা।'

ছেলে জিজ্ঞাসা করছে, ''তোমার কি হয়েছে বাবা''?

—ও কিছু না। তুই খা।

তাহলে দেখ, স্নেহের আসনে সে কত বড়। তোমার বাবা অবস্থাক্ষেত্রে আর একজনের কাছে চোর বা ডাকাত হতে পারে। কিন্তু তোমার কাছে তো পূজনীয়। তোমার কাছে সে শুদ্ধ বুদ্ধ পবিত্র। সন্তান জানে, 'বাবা আমার জন্য প্রাণ দেবে।' সন্তানের কাছে সে দেবতার আসনে রয়েছে। অভিনয়ের মঞ্চে নয়— অন্তর থেকেই সে বাবাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে।

আমি দেখবো, তার (পিতার) ভিতরে সেই সুরটা আছে কি না। এর মধ্যে বুঝ আছে, কর্ত্তব্যবোধ আছে। আমি মাপকাঠিতে দেখলাম, সে (পিতা) মহান। মহান যদি হয়, তবে কেন সে উঁচু

আসনে থাকতে পারবে না? প্রকৃতি বলছে, 'কারও মধ্যে এতটুকু যদি মহত্ত্ব থাকে, ব্যক্তি বিশেষে সেকেণ্ডের মধ্যে তা ফুটে উঠতে পারে।' আসামে ডিগবয়ে তেলের খনি কিভাবে আবিষ্কৃত হল? এক ফোঁটা তেলের ছিটা এসে পড়েছিল। তাতেই বুঝে নিল, তেলের খনি আছে। আজ ডিগবয় তেলের খনির জন্য বিখ্যাত হয়ে গেছে। আমি দেখবো, তোমার মধ্যে সেই ছিটাটা আছে কি না। গাভী কি করে? সব দুধ দিয়েও বাছুরের জন্য টেনে দুধ রেখে দেয়। তার মধ্যে স্নেহ আছে, স্নেহের সুর আছে। তবে সে কেন মহান হবে না?

বর্ত্তমান সমাজে প্রচলিত তথাকথিত সংস্কারগত ধর্মের নামে কতগুলি সাধু মহান নামধারী ব্যক্তি নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। ধর্মের প্রকৃত অর্থ তারা নিজেরাও বোঝেনি, অন্যকেও বুঝাতে পারছে না। আত্মা, ইহকাল, পরকাল, প্রারব্ধ, কর্মফল, প্রায়শ্চিত্ত, পাপ-পুণ্য মুক্তি ইত্যাদির গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে তারা নিজেরাও হাবুডুবু খাচ্ছে, আর গোটা সমাজটাকেই করছে বিভ্রান্ত। ঐ সমস্ত অযথা কথা, অযথা ব্যবহার— তোমাদের জন্য নয়। ঐসব পাঠ টাঠ শুনে কখনও মনের মধ্যে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করবে না। রাস্তাটা ক্লীন থাকলে গাড়ী ভালভাবে চলে যায়। ঐ সমস্ত ভেকধারী সাধু মহানরা নিজস্ব কথা দিয়ে সব মাটি করে দিয়েছে।

তোমরা প্রকৃতির গ্রন্থে ডুবে থাক। সবসময় মনে করবে, ''আমরা স্বচ্ছ এই ফাঁকার মধ্যে ডুবে আছি। আমরা ভরপুর হয়ে আছি। আমরা পরম আনন্দে আছি।'' আর আছে তোমাদের গুরুর দেওয়া বীজমন্ত্রের ঐ ধ্বনি। গুরু ঐ ধ্বনিটা দিলেন কেন? **প্রকৃতির মহা সুরের সাথে তোমার ধ্বনি যাতে একযোগে মিশে যায়, তারজন্যই পেয়েছ এই মহা মূল্যবান সম্পদ, এই নাদধ্বনি। এই ধ্বনি যে যত রেওয়াজ করবে, বিরাটের সুরে তার ভাণ্ডার ততই**

ভরে উঠবে। তোমাদের এমন একটা ধ্বনি আছে, মনের মধ্যে যা কিছু হয়ে যাক, তোমরা এর মধ্যে ডুবে থাক। এই ধ্বনি, এই সুর অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর মাঝেই আছে, অনন্ত বিশ্বের গভীর সুর। আর এই পথই মুক্তির পথ, যা তোমাদের জন্য খোলা।

শাস্ত্রের অনেক বোল আছে। শাস্ত্রের কথা তৈরী করেছে অধিকাংশ তথাকথিত সংস্কারগত শাস্ত্রজ্ঞেরা। যার যার নিজস্ব বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তারতম্য হবেই। আমি জানি এদের পাণ্ডিত্য আছে। কিন্তু এটা পাণ্ডিত্যের বিষয় নয়। একজন সারা দেশ ভ্রমণ করে এসেছে। আর একজন বড় বড় মানচিত্র রেখে, সারা পৃথিবীর কোথায় কোন্ দেশ আছে, একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছে। দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ'ল। মানচিত্র পড়ে যে জেনেছে, সে বিভিন্ন দেশের বর্ণনা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দিল যে, সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সেই ব্যক্তিই মেডেল পেল। আর যে সত্যিকারের দেশ ভ্রমণ করে এসেছে, সে মুখ কালো করে বসে রইল। সে হেরে গেল। দু'দিন পরে জানা গেল যে, ঐ ব্যক্তি যে জয়লাভ করেছে, দেশের বাইরেই যায় নাই। এই তো অবস্থা। আমাদের দেশের ডোমেরা এ্যানাটমি সম্পর্কে যা জানে, বড় বড় ডাক্তাররাও তা জানে না। গ্রন্থের প্যাঁচে যারা পড়েছে, গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে তারা মরেছে।

সত্যিকারের সুরে যারা থাকে, তারা গ্রন্থের প্যাঁচে যায় না। তোমরা স্বচ্ছতা থেকে তৈরী হয়েছ, স্বচ্ছ গতি তোমাদের। তোমরা চলেছ অনন্ত গতির পথে শোঁ শোঁ করে। তার সঙ্গে গুরুপ্রদত্ত ঐ ধ্বনি বা মন্ত্রের প্রয়োজন আছে। সর্ব অবস্থায় ভরপুর থাকবে। সবসময় তোমরা চিন্তা করবে, ''আমরা ভরপুর থেকে এসেছি। আমরা ভরপুর হয়ে আছি।'' অন্যদের সহজে এই চিন্তা আসবে না। যতই বাংলা শেখাও, সাহেব কখনও 'তুমি' বলবে না, 'ঠুমি'

বলবেই। কারণ সে গ্রামার শিখে এসেছে কি না।

তোমাদের ঐ একটা কথা, 'মাঝে মাঝে বড় চিন্তা আসে, প্রভু।''

আমি বলি, তারজন্য তোমার ব্যস্ততা কেন? তোমার মধ্যে কি আসে বা না আসে, সেই ভাবনায় তোমার ঠেকাটা কি? **তোমাদের মধ্যে যা আসে, এগুলো হ'ল হাটে বাজারে, স্কুলে, অফিসের বিড় বিড় কথা। গুরুত্বহীন কথাই বিড় বিড় করে বের হয়। বিশ্বের কাছে গুরুত্ব নাই বলেই গুরুত্ববিহীন। মনের যত আবর্জনা বিড় বিড় করে বের হবেই। শরীরের ভিতরের যত ময়লা সর্দি, কাশি, ঘাম, মল মূত্ররূপে বেরিয়ে যায় না? এইসব বিড় বিড়ানি চিন্তা মনের যত ময়লা। এগুলো সময়মতো বের হবেই।** এগুলো ধরে বসে থাকার জিনিস নয়। এরজন্য বসে থাকবে না। এসব নিয়ে তোমাদের ভাববার দরকার নাই। মনের ভিতরে বিড়বিড়ানি চিন্তা, যা আসে আসুক, যা যায় যাক। ও দিকে মন দেবার প্রয়োজন নাই। তবে এইগুলো উৎপাত করে কেন? ভিতরের জমানো জিনিস, মনের মলগুলো বের না করলে চলে কি? যত বের করা যায়। বিড় বিড় করে বেরিয়ে যাক। ষ্টীমের মতো, যত বেরিয়ে যায়।

ষ্টীম গরম সবসময় থাকবে। এটা ভিতরেও গরম, বাইরেও গরম, সামনে দিয়ে গেলেও গরম। তোমাদের মধ্যে যে বিরাট ষ্টীম চলছে, সে তো তার কাজ করবে; সেটা বেরোবেই। ''আমি জপ করছি। আমার পাপ-পুণ্য, মুক্তি, কোন কিছুর দরকার নেই'', এই চিন্তায় অদ্ভুতভাবে কাজ করবে। গুরুগত প্রাণ হয়ে থাক। রাধা কৃষ্ণ প্রকৃতি পুরুষের মিলনের যে সুর, সেই সুর নিয়ে থাকবে। সবসময় মনে প্রাণে চিন্তায় ভাবনায় ভরপুর হয়ে থাকবে।

দৈনন্দিন জীবনে হাটে বাজারে অফিসে আদালতে যত সব

কথা, সব যেন ধুলার মত লাগছে। ধুলার জগতে ধুলা তো লাগবেই। কত আর ঝাড়বে? এই যে রাস্তা দিয়ে যাও, মুক্ত বায়ু টেনে নিচ্ছ, ধুলা যায় না? এইজন্যই দাড়ি আর নাকের লোম। মেয়েরা বলতে পারে, তাদের তো দাড়ি নেই? কিন্তু নাকটা তো আলাদা করে দিয়েছে। সৃষ্টির প্রোটেক্শন্ এত সুন্দর, সেখানে অসুবিধার তো কিছু নাই। পায়ের ধুলো যেটা ঢুকতে চায়, ভিতরে গেলেই পা ধুয়ে ফেলে দেয়। পচা গন্ধ শুঁকলে থুথু ফেলতে হবে, এটা কি কাউকে শিখিয়ে দিতে হয়? আপনা আপনি ফেলে দেয়। এত বয়স হয়ে গেল, এই যে বক্‌বক্ করেই চলেছ, লাভ হয়েছে কিছু? অনন্ত গতির পথে গতিময় হয়ে তোমরা চলেছ। কিন্তু বুঝতে পারছো না।

ছেলে বাবার সঙ্গে ট্রেনে চলেছে। অন্য আর একটা ট্রেন দেখে বলছে, ''বাবা, ট্রেনে চড়ুম।'' বাবা বলে, ''ট্রেনে চড়বি? তুই তবে কিসের মধ্যে বসে আছিস্?'' এত বড় বিরাট গতির মধ্যে চলছে সবাই। তবুও বলছে, ''গতির মধ্যে যাব।'' প্রকৃতির সেই গতির মধ্যে রয়েছো তোমরা। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ স্থান নিয়ে রয়েছ। তাঁর মাহাত্ম্য চিন্তা করে আরও গভীরভাবে কাজ করে যাও। পেয়ে যাবে মুক্তির পথ। মুক্তির পথের পথিক সবাই। কোন চিন্তা নেই। তোমাদের হবেই। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

জীবনে চলার পথে বেদই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির পথ

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৭
২৬শে জুলাই, ১৯৭০

আরও লোক আসুক। তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি। চারিদিকে বড় গোলমাল হচ্ছে। বেদের যুগের কথা কালও শনিবারের ক্লাসে বলা হয়েছে। (বেদমন্ত্র...) ঋষিরা যখন বেদপাঠ করতেন, অনর্গল বেদ বলতেন। আজ হতে লক্ষ বছর আগের কথা বলছি। তখনকার যে বেদ, সেই আদিবেদে তাঁরা সুর দিতেন। বিশ্বসৃষ্টির নিয়মের সাথে সাথে বেদ আপনি আপন সুরে সৃষ্টি হয়েছে। তখনকার সমাজে বেদের অনুশাসন ছিল।

সেইসময়ে দেশময় জল ছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়ে উঁচু জায়গা ছিল। পাহাড় পর্বতের উঁচু জায়গায় বাসিন্দাদের মন্দির থাকতো। মন্দিরে কোন মূর্ত্তি থাকতো না। শুধু ভোজপাতা থাকতো। ঋষিরা ভোজপাতায় বেদ লিখতেন। সবাই এসে সেখানে বসতো। বেদ শুনতো। চারিদিক থেকে সবাই সেখানে পাগলের মতো ছুটতো বেদ শুনবার জন্য। **বেদ মানুষের সৃষ্টি নয়। প্রকৃতির অনন্ত নাদধ্বনিই বেদধ্বনি। এই নাদধ্বনিতে, বেদধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে জীবজন্তু, পশুপাখীরাও সেখানে জড় হতো; বেদ শুনতো।**

বেদবাণী কোন মানুষের বাণী নয়। বেদবাণী দৈববাণী, আকাশের বাণী। এই বাণী শুনবার জন্য সকলে আকুল হতো। ঋষি বলছেন, ''মেঘের ভিতর যে গর্জন হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, তাতেও ভাষা আছে।'' তা হতেও তাঁরা ভাষা উদ্ধার করতেন। প্রকৃতিতে

কখন কিভাবে কি হবে, তা যেন রেকর্ডের দাগের মত দাগ কেটে রেখে দিয়েছে। রেকর্ডের থালার মধ্যে সব যেন লেখা রয়েছে। তাই তাঁরা উদ্ধার করে দিতেন। কারণ তাঁরা তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে সেই লেখা দেখতে পেতেন। সেটাই তাঁরা বলতেন।

আমাদের জীবনে চলার পথে বেদ নির্দেশ দিয়েছেন। সৃষ্টির সাথে সাথেই নির্দেশ দিয়েছেন বেদ। আমাদের কিভাবে চলতে হবে, বেদ তার বিধান দিয়েছেন। বিশ্বসৃষ্টির আইন অনুযায়ী এই বেদ সৃষ্টি হয়েছে। বেদজ্ঞরা সুখাসনে বসে, ধ্যান গম্ভীরে বসে আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে চিন্তা করতেন ও বেদ শুনাতেন। বেদ এখানকার রামায়ণ বা মহাভারত পাঠের মত নয়। ডুবুরীরা যেমন গভীর সমুদ্রের তল হতে সংগ্রহ করে মূল্যবান জিনিস, বেদজ্ঞরা তেমনি বিশ্বের সুরের সাথে সুর মিলিয়ে, আকাশমার্গের ধ্বনি নিয়ে এসে সবাইকে জানিয়ে দিতেন (বেদমন্ত্র...)।

বেদজ্ঞদের ধ্বনি শুনলেই মুক্তি হয়ে যায়। (বেদমন্ত্র...) তাঁরা দেহবীণাযন্ত্রের থেকে সুর খুঁজে বের করতেন এবং মূলাধার থেকে সুর নিয়ে আজ্ঞাচক্রে ও সহস্রারে সেই সুর দিতেন। (বেদমন্ত্র...) বেদের নিয়মে যদি সমাজ চলে, তবে সেই সমাজ হবে মধুময়। সমাজে কি কি হয়, বেদ তাই বলে যাচ্ছেন। **বেদের ধারাতে যদি সমাজ চালিত হয়, তবে জীবজগৎ কোন্ স্তরের কোন্ অবস্থায় থাকবে, তাহাই বেদ বলেছেন** (বেদমন্ত্র...)। বেদ প্রথমেই বলেছেন (বেদমন্ত্র...), ''দেশের সবাই এক হয়ে থাকবে। সবাই একত্র হয়ে চাষবাস করবে। এতে একসময়ে যে খাদ্য উৎপন্ন হবে, তাতে তিন বছর চলে যাবে।'' তবে বোঝা, এক এক বছরে তিন বছরের খাদ্য মজুত হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা চিন্তা করতেন, ''এত খাদ্য কে খাবে?''

শুধু নিজেদের জন্যই নয়, জীবজন্তুর জন্যও তাঁরা খাদ্য

সঞ্চয় করতেন। জীবজন্তুর খাদ্যের জন্যও শস্য উৎপন্ন করা হতো। তোমরা যেমন সবার সঙ্গে একত্রে বসে খাও, তেমনি বনের পশুরা সবাই এসে একত্রিত হয়ে, খাবার খেয়ে যেত। সেইসময়ে মনের মাঝে হিংসা ও খাওয়াখাওয়ি ছিল না। মাছ-মাংস তখন কেউ খেত না। কাজেই বনের পশু ও মানুষ সব এক জায়গায় জড় হয়ে, একই আসনে এসে খেত।

দেশের চারিদিকে খাওয়া পরায় কোন অভাব ছিল না। সেই অবস্থায় তাঁরা সবাই কি করতেন (বেদমন্ত্র...)? তাঁরা চাষবাস করতেন। সবাই ধ্যান-ধারণা করতেন। লেখাপড়া করতেন। এখানকার এই স্কুলে পড়া নয়। তখন স্কুল কলেজ ছিল না। তাঁরা প্রকৃতির থেকে শিক্ষা নিতেন। সবাই প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠ করতেন। (বেদমন্ত্র...) বেদের ভিতর যে নিয়ম আছে, যে সুর আছে, তাই নিয়ে তাঁরা চলতেন এবং এক একজন তা চর্চা করে বিশেষজ্ঞ হতেন। সমাজে প্রতিটি কাজের মর্যাদা ছিল সমান। কাজের দিক থেকে প্রত্যেকের ছিল এক আসন।

সমস্ত পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামান্তরে প্রত্যেকের সুবিধামতো এক জায়গায় খাদ্য মজুত করে রাখা হতো। সেখান থেকে যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য নিয়ে নিত।তাছাড়া ঘি, দুধ, দই রাখার জন্য বড় বড় কূপ খনন করে সেখানে রাখা হতো, সকলের প্রয়োজন মিটাবার জন্য। এখন এটা কল্পনা বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের যত দালদা, ঘি যদি ঢালো, বড় বড় পুকুর হয়ে যাবে।

তখনকার দিনে 'আমার গাভী', 'আমার ক্ষেত' বলে কোন কথা ছিল না। তাদের সবকিছুই ছিল 'আমাদের'। হাজার হাজার চমরী গাই, দুধের ভারে নত হয়ে দরজায় দরজায় চলে আসতো। তারা যেন বলতো, 'দোহন করে তোমরা আমাদের মুক্ত করো।' সেইসব দুধ দোহন করে বড় বড় বালতিতে রাখা হতো। যার যার

প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ে যেত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেউ কোন খাদ্য নিত না।

দেশবাসী সবাই একত্রিত হয়ে এক জায়গায় বসে সাধনা করতো। বিশ্বরহস্য জানার জন্য, মনের দিক থেকে কিভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, তার পথ পদ্ধতি জানার জন্য তারা সাধনা করতো। আবার ঘর সংসারের কাজকর্ম, যাবতীয় ব্যবস্থাও তারা করতো। তাদের ঘরে তালা চাবি দেবার প্রয়োজন হতো না। কাল ক্লাসে বলেছি, তারা 'মিথ্যা কথা' জানতো না। চুরি জানতো না। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে একবার একজন, বেদজ্ঞের কাছে গিয়ে 'মিথ্যা' শব্দটা বুঝতে চাইলো। বেদজ্ঞের ঐ 'মিথ্যা' বুঝাতে ছয় ঘণ্টা লেগেছিল। আর আজকে একটা ছোট বাচ্চাও জানে 'মিথ্যা' কাকে বলে। এখন 'সত্য কি' বুঝতে ছয় ঘণ্টা লাগবে।

তখনকার সময়ে যে চাষবাস করতো, তাতে 'আমার ক্ষেত', বলে কিছু ছিল না। কেউ বলতো না, ''আমার ক্ষেত চাষ করি।'' (বেদমন্ত্র...) সেইসময়ে চাষবাসের আর শেষ ছিল না। সবাই চাষ করতো। আর উৎপন্ন শস্য এক জায়গায় সব রাখতো। এতে সমাজ উন্নতির পথে যেতে আরম্ভ করলো। তখনকার সময়ে এইভাবে সকলে মিলেমিশে চলতো। শিল্প বিদ্যা থেকে শুরু করে সমস্ত বিদ্যা উন্নতির দিকে যাচ্ছিল।

আজ যে সবকিছু বিপরীত দিকে যাবে, বেদ তার ইঙ্গিতও দিয়েছিল। (বেদমন্ত্র...) দেবদেবতাদের হাতের অস্ত্রশস্ত্রই তার প্রমাণ। এই অস্ত্র দিয়ে তারা শত্রু বলি দিত। তারা জানতো, সমাজের বুকে এইরকম শয়তান আসবে। অস্ত্র দ্বারা তাদের সরিয়ে দিতে হবে। তাদের বলি দিতে হবে। আর জ্ঞান ও প্রেমের অস্ত্র দ্বারা সমাজকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজকে রক্ষা করা, বেদের প্রথম

অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হতো। (বেদমন্ত্র...) আজ কোনদিকেই আমরা বিহিত করছি না। এখন সর্বত্র মারামারি, হানাহানি। কতগুলি শয়তান প্রকৃতির লোক, দুষ্ট প্রকৃতির লোক অভাব সৃষ্টি করে সমাজকে শেষ করে দিচ্ছে।

বেদের যুগে সব ঋষিরা, বেদজ্ঞরা দেশবাসীকে বলতেন, ''তোমরা জপ, তপ কর। সমাজে সকলের খাওয়া পরার বিধি ব্যবস্থা করে, তারপর যা কিছু কর। যদি নিজের জীবনের উন্নতি করতে চাও, তবে সমাজের উন্নতি কর।'' তখন সমাজে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। তাদের মানসিক ব্যাধিও ছিল না। সমাজে কোন ক্লেদ পঙ্কিলতা প্রবেশ করেনি। তারা আপনমনে ধ্যানধারণা করতেন বসে বসে, এই সৃষ্টির স্রষ্টাকে খুঁজে বার করার জন্য। তখন ভগবানের নামও ছিল না। ভগবানের নাম কেউ করতো না। তারা জানতেন, এই অনন্ত জগতের সৃষ্টির মূল কারণ খুঁজে বের করতে হলে, মহাকাশের সুরকে জানতে হবে।

বেদজ্ঞরা মহাকাশের চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। তারা ভাবতেন খালি আকাশে বিদ্যুৎ চমকের প্রয়োজন কি? খালি আকাশে মেঘের গর্জন বর্ষণের নিশ্চয়ই কারণ আছে। মেঘের এই গর্জন হচ্ছে ধ্বনি, নাদ। ঐ ধ্বনিকে, ঐ নাদকে আশ্রয় করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে জীবনের চলার পথে সবকিছুর মূল এই নাদ। এই যে খালি আকাশ, একেও ধ্বনি বা নাদ বলতে পার। সমস্ত বিশ্বকেই নাদধ্বনি বা বেদধ্বনি বলতে পার।

ধ্বনি কখনও নষ্ট হয় না। ধ্বনি চিরকাল থেকে যায়। তোমরা যে কথা বলছো, এটা চিরযুগ থেকে যাবে। এই জগৎ ধ্বনিময় হয়ে আছে। এই ধ্বনির সাধনা ও নাদের সাধনা করতে করতেই ঋষিরা সুর খুঁজে পেলেন। এই সুরই হচ্ছে সবকিছুর সার। এই সুরই

ভগবান। যে চৈতন্যের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই চেতন বা চৈতন্যকেই আমরা ভগবান বলি। এইভাবে আমাদের জীবনে যাতে অতি সহজে আমরা বেদকে স্মরণ করতে পারি, সৃষ্টির আদি সুরকে জানতে পারি, তারজন্য বেদজ্ঞরা বলেছেন, ''তোমরা শুধু সুর দিয়ে যাও। তবেই সেই সুরে ভেসে উঠবে আদি সুর। সেই সুর বেঁধে আনবে অনন্ত জগতের সুর''।

বেদজ্ঞরা নাদধ্বনি মনন করে চলেছেন। তাঁরা আপনমনে শূন্যে চলে যেতেন। এক লক্ষ বছর আগেকার কথা বলছি। বেদজ্ঞ বলছেন, **''আমি পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আছি। আমার মন মহাকাশে শূন্যমার্গে চলে গেছে। কতক্ষণ পরে দেখি, আমার দেহ শুদ্ধ আপনমনে শূন্যে চলে যাচ্ছে।'' (বেদমন্ত্র...) তাঁদের দেহ মনের সবকিছু আকাশে চলে গেছে।** সেখানে কোন কুল কিনারা নাই। দাঁড়াবার বা বিশ্রাম করবার কোন জায়গা নাই। কোন পাড় নাই, কোন কিছু নাই। মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে, জানে না। শুধু আপনমনে চলে যাচ্ছে। এই যে যায়, কেমন করে যায়? একটা চুম্বক বড় বড় লোহাগুলিকে কেমন টেনে নিয়ে যায়। বড় বড় কারখানায় সেই চুম্বকের টানেই বড় বড় লোহাগুলিকে টেনে নিয়ে যায়। এইভাবেই নিয়ে যায়। ঋষি দেখছেন, মননের টানে টানে তাঁর নিজ দেহ পর্যন্ত শূন্যে চলে যাচ্ছে।

বেদজ্ঞরা ভাবলেন, এভাবে তো সমাজের সবার পক্ষে মহাশূন্যে গমনাগমন করা সম্ভব নয়। এই চিন্তা, এই ভাব তো সমাজের সকলে নিতে পারবে না। **জীব যাতে অতি সহজে মুক্তির পথে যেতে পারে, তাঁরা সেই চিন্তায়ই বসে গেলেন। বেদজ্ঞরা দেখলেন, এই মন শুধু দেহতেই নয়, অনন্ত বিশ্বের মহাকাশে এই মন বিরাজ করছে। এই মহাশূন্যকে, মহাকাশকে মন বলা যায়। তাই বেদ**

একদিকে মনের কাজ করছে, অপরদিকে ধ্বনির কাজ করছে। মনকে একাধারে বেদ বলা চলে, ধ্বনিও বলা চলে।

আমাদের মনে কত কি আসছে; চারিদিক হতে ছল চাতুরী ঘিরে ধরছে। তা হতে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়? বেদ বলছে, মনের মাঝে যা কিছু আসছে, আসতে দাও। এসব আছে থাক। তুমি নূতনভাবে নিজেকে পরিবর্ত্তন করো। সমস্ত ক্লেদ পঙ্কিলতাকে ফেলে দিয়ে তুমি তোমার কাজ করে যাও। ওগুলোর জন্য ভাবতে হবে না। কি করে উপলব্ধি করা যায়? চিন্তা করতে হবে না। তোমরা অনুভূতির রাজত্বে আছ। নূতন করে আর কিছুর প্রয়োজন হবে না। **যে বীজ তোমার হাতে আছে, তাই পুঁতে দাও। বীজ তৈরী করতে হবে না। যে বীজ আছে, তাই ক্ষেত্রে (দেহ ক্ষেত্রে) ফেলে দাও। আপনি অজস্র বীজ তৈরী হয়ে আসবে। সুতরাং জীবনে চলার পথে বেদই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির পথ।** বেদজ্ঞরা, ঋষিরা প্রকৃতির সুরের সাথে একত্রিত হয়ে, মূলাধার হতে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রার, এই সপ্তচক্রের সমন্বয়ের সুরে বাঁধা ছিলেন বলেই সেই সুরে সুর দিতে পেরেছিলেন এবং অনন্ত বিশ্বের রহস্য জানতে পেরেছিলেন।

তখন ঋষিরা দেবতাদের কাছে যেতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা বিষ্ণুর কাছে গেলেন, ''প্রভু আমাদের কি করণীয়?''

বিষ্ণু— তোমাদের আর কিছু করতে হবে না। বেদের আকাশস্থিত যে নাম, ঐ নামই প্রচার কর।জীবজগৎকে ঐ নাম শুনাও। তারই ব্যবস্থা কর। কেবল নামই গেয়ে যাও। তাতেই সবকিছু ভরপুর হয়ে যায়, সাজানো হয়ে যায়।

তাই দেবর্ষি তখন থেকেই নাম শুরু করলেন। সেদিন থেকে দেহবীণাযন্ত্রে নাম উচ্চারণ করে করে, নাম প্রচারে বের হয়ে গেলেন।

বেদ সম্বন্ধে শিব বলেছেন। (বেদমন্ত্র...) কি বলেছেন? তাঁর মন চলে গেছে সমস্ত বিশ্বময়। তিনি দেখলেন, স্রষ্টার (চৈতন্যের) অনন্ত গতির সাথে তিনি গতিময় হয়ে গেছেন। সেই যে অনন্ত গতি যার শেষ নাই, সেই শেষবিহীনের সুর হতে এই বেদ এসেছে। শিব বলছেন, ''সেই শেষ নাই যেখানে, সেই অনন্ত গতির পথে সহস্রারের মাঝে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অনন্ত বিশ্বে আমি বিশ্বের সমস্ত সুরকে উপলব্ধি করে, সুরে সুরময় হয়ে, সর্ব সুর এখান হতে অবগত হয়ে, আমার নিজস্ব সত্তাকে উপলব্ধি করছি সর্ব বিষয়বস্তুতে। আমার দেহের রক্তকণিকায় মজ্জায় সমস্ত অস্তিত্বে আমি বেদময় হয়ে গেছি। আমাতে আর বেদে কোন প্রভেদ নাই, কোন পার্থক্য নাই। শিবের বাণী যা পাই আমরা, শিব নিজে বলে গেছেন। শিব বলছেন, ''আমি বেদের সঙ্গে মিশে গেছি। বেদের সঙ্গে আমি মিশে রয়েছি।''

দেবর্ষি হাতজোড় করে শিবের কথা শুনছেন। বিষ্ণু সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, ''দেবর্ষি, আকাশের এই যে নীলবর্ণ দেখছো, এই বর্ণ কোনদিনই নীলবর্ণ নয়। কিন্তু অনন্ত গভীরতার মাঝে মনে হয়, যেন নীলবর্ণ। আমার দেহ মন সব ঐ নীলবর্ণের সাথে এক হয়ে গেছে। ঐ নীলবর্ণের সাথে এক বর্ণ হয়ে গেছে। দেবর্ষি, এই বর্ণ হতেই হবে প্রকৃতির বর্ণবোধ। তুমি সবাইকে এই বর্ণে নিয়ে যাও। তাতেই বর্ণবোধ হবে। মহাশক্তির সুর কেমন করে জাগবে, তখনই বুঝতে পারবে। তারজন্য তোমায় গান গেয়ে যেতে হবে। তুমি গান গেয়ে যাও।''

বিষ্ণু বলছেন, (বেদমন্ত্র...) এই নাম তুমি করবে, 'রাম নারায়ণ রাম'। দেবর্ষি, তুমি জেনো, রাম এবং নারায়ণ থেকে সর্ব জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আকাশস্থিত এই নাম 'রাম নারায়ণ রাম'। এই রাম এবং

নারায়ণকে স্মরণ করার জন্য তুমি এই নাম করে যাও এবং দ্বারে দ্বারে এই নাম পৌঁছে দাও। তোমার মধ্যেই নামের সুর বইতে থাকবে এবং তুমি সুরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

দেখ, 'নারায়ণ শিলা'র চোখ নেই, মুখ নেই, কান নেই, মাথা নেই, দেহ নেই। তিনি গোলাকার। তিনি আকাশ স্বরূপ। আকাশেরও চোখ নেই, মুখ নেই, হাত নেই, পা নেই, আবার সমস্ত জগৎ তার মাঝে ব্যাপ্তমান। তাই আকাশ হচ্ছে নারায়ণ স্বরূপ। এই আকাশের শেষ নাই। এই 'নাই' হতে আবার জীব জগৎ সবার সৃষ্টি। (বেদমন্ত্র...) আকাশের আদি নাই, অন্ত নাই। আরম্ভ নাই, শেষ নাই। আবার তা হতেই নব নব রূপের সৃষ্টি। রূপে রূপে রূপান্তরিতের মাঝে হাজার হাজার গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবীর সৃষ্টি হয়ে চলেছে। সুতরাং তাঁকেই (মহাকাশকেই) নারায়ণ রূপে, রাম রূপে বর্ণনা কর। দেবর্ষি তখন দেহবীণাযন্ত্রে সুর দিলেন 'রাম নারায়ণ রাম।' তিনি এই মহানাম আরম্ভ করলেন।

শিব দেবর্ষিকে আশীর্বাদ করে বললেন, ''দেবর্ষি, তুমি তোমার দেহবীণাযন্ত্রে মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্রে সহস্রারে এই ধ্বনি বাজাও। সমস্ত বিশ্ব জগৎ ঘুরবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত বিশ্বের আদি সুরের সুর এই যন্ত্রে, এই সপ্ত চক্রের সপ্ত সুরে বাঁধা। তুমি শুধু এই সপ্ত সুরে বাজাও এই ধ্বনি এই দেহবীণা যন্ত্রে।

দেবর্ষি শিবের নির্দেশে সুর দিলেন। শিব নিজে এসে সপ্ত সুরে টান দিলেন। সাথে সাথে বেজে উঠলো; বেজে উঠলো রাম নারায়ণ রাম। জেগে উঠলো রাম নারায়ণ রাম। মূলাধারে আজ্ঞাচক্রে সহস্রারে জেগে উঠলো রাম নারায়ণ রাম। জেগে উঠলো ঐ ধ্বনি রাম নারায়ণ রাম।

দেবর্ষি নারদ হাতজোড় করে বসে আছেন বীণাযন্ত্র হাতে

নিয়ে। এতেও সুর দিচ্ছে, রাম নারায়ণ রাম। আবার আজ্ঞাচক্রে সহস্রারেও ঐ একই সুর দিচ্ছে, রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম।

বেদ বলছেন, আমি নিজেই সেই নাম হয়ে গেছি। বেদগত প্রাণ হয়ে, বেদগত সুর হয়ে যাও। আকাশগত এই নাম রাম নারায়ণ রাম। বেদ বলছেন, আমি সুর, আমি ধাম, আমি এই নাম; রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম।

শিব শম্ভু বলছেন, একই সুরে যে করিবে এই নাম, মুক্ত হইবে এই নামে রাম নারায়ণ রাম, রাম নারায়ণ রাম। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, কর এই নাম রাম নারায়ণ রাম। এমনি করে দ্বারে দ্বারে কর এই নাম রাম নারায়ণ রাম।

ভূলোক, ভবলোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক— এই সপ্তলোকে আলোকিত এই নাম, রাম নারায়ণ রাম। যোগপ্রক্রিয়ায় যোগাযোগে যুক্ত এই নাম, রাম নারায়ণ রাম। ঘরে ঘরে বল এই নাম রাম নারায়ণ রাম। আকাশে বাতাসে কর এই নাম রাম নারায়ণ রাম। **আজ্ঞাচক্রে কর এই নাম রাম নারায়ণ রাম। সম্মুখে কর এই নাম রাম নারায়ণ রাম। সুক্ষ্মে অতিসূক্ষ্মে অন্তরের অন্তরালে কর এই নাম রাম নারায়ণ রাম। দেহের অণুতে পরমাণুতে কর এই নাম রাম নারায়ণ রাম।** স্রষ্টার সৃষ্টিতে প্রতিটি সৃষ্টবস্তুতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই নাম রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। রাম নারায়ণ রাম। এই মহানামেই জীবের মুক্তি। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

প্রকৃত জ্ঞান লাভের দ্বারাই মুক্তি সম্ভব

৪৬ ভুপেন বোস অ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার কোলকাতা
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩

এই যে ভালমন্দ বিচার, ইহাই তোমাদের একমাত্র কাজ। মূর্তিপূজার ভিতরে যে সংস্কার, একেবারে বর্জন করতে হবে। এখানকার তথাকথিত সংস্কারগত ধর্মের নামে বেশী কিছু চিন্তা করার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে যত বিভেদ আর বৈষম্য। 'আছে' কি 'নেই' তার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি আমরা সত্যবস্তুকে জানতে। তুমি যে সর্বত্র, তোমাকে একটু খুঁজলেই বুঝতে পারবে। সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়বস্তু জল, বাতাস, আগুনের সম্মিলন। জল, বাতাস, আগুন প্রত্যেকেই আবার অজস্র অজস্র অণুর সম্মিলন। আবার প্রত্যেকটি অণু অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার সংমিশ্রণ।

Queen bee হচ্ছে মন। মন যেখানে সেখানেই তুমি। **যদি তোমাতে, ইন্দ্রিয়তে এবং মনে একই সাজে সজ্জিত থাকে, তবে ধ্যেয় বস্তু অচিরেই মিলে যাবে।** আজ ধ্যানের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে সংকীর্ণতা ও ভীতি। সংস্কারের সম্মুখীন হয়ে আজ আমরা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছি। একমাত্র উপায় প্রকৃত জ্ঞান। **প্রকৃত জ্ঞানলাভের দ্বারাই মুক্তি সম্ভব।** প্রাচীনযুগে, ঋষিদের যুগে সহজপথ ছিল যাগযজ্ঞ, হোম। সেটা এখন দুর্গম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ধ্বংসকে আলিঙ্গন করবো, যেখানে দেখবো সেটাও একটা শক্তির বিকাশ; যার পিছনে কোন সংস্কার নাই।

'সম্ভবামি যুগে যুগে', যারা মুখে মুখে আওড়ায় (উচ্চারণ করে), তারা যুগ পরিবর্ত্তন করুক। শুধু কথায় কোন কাজ হয় না। তারা সেই সুদূরের প্রতীক্ষায় বসে আছে, 'যদি তিনি

আসেন,' 'যদি তিনি কৃপা করেন', এতে কোন কাজই হয় না। এ যে কল্পনা ব্যতীত আর কিছু নয়। কাল্পনিক বাসা বানানো কল্পনাতেই সম্ভব। রিটায়ার্ড লাইফের একজাতীয় গবেষণা চলছে এখন ধর্মের নামে। বিশ্বাসের বস্তু যতক্ষণ না সম্মুখীন হয়, ততক্ষণ অবিশ্বাস করেই যাব। গাঁথনি পাকা থাকলে কয়েক তলা কল্পনা করা যায়। আর গাঁথনি কাঁচা হলে তলা (একতলা দোতলা) হবে কি করে? আমরা জানতে চাই সেই সত্যবস্তুকে, আমার বিচারের খাতায় যে বস্তু সম্মুখীন হয়। **আজ শাস্ত্রকে বিকৃত করে ফেলেছে। তাদের ভাষায় কর্মের উপর যদি জন্ম নির্ভর করে, তবে কয়জনা যে মানুষ হবে, সমস্যার বিষয়।**

পাপপুণ্য বিনাশ করা বা অর্জন করা, যদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা করতে হয়, তবে সারা জীবনের রোজগারেও কিছু হবে না। বহুযুগের পুরানো শাস্ত্র এ যে একেবার হাঁটা পথ। হাঁটাপথে দিল্লী যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই আর এখন।

আয়ু একবছর, একমাস, একদিন, একঘণ্টা, এক সেকেন্ড হলেও এই মনই থাকবে, এই জ্ঞানই থাকবে, এই বিচারটাই থাকবে। কাজেই ৬০ বৎসরের সমস্ত অহঙ্কার এক সেকেন্ডে smash করে (নষ্ট করে) আমরা সম্মুখীন হতে চাই সেই পরম বস্তুর, যা অবগত হলে সব অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ বিরাটের উপলব্ধি পাওয়া যায়। এই দেহবীণাযন্ত্রের মাঝেই, সীমিত অবস্থার মাঝেই অসীমকে, বিরাটকে উপলব্ধি করতে চাই। আমরা সাগরও হবো, আবার ঢেউও হবো।

সংস্কারের কাঁথা বাছতে হলে, একটি একটি করে সুতা জীবনভর বাছলেও সংস্কার বর্জন শেষ হবে না। কাজেই একটা সুইচ বের করতে হবে, যা টিপলেই কাজটা সহজ হয়ে যায়।

এখনকার তথাকথিত সংস্কারগত শাস্ত্রজ্ঞদেরও বেশীরভাগেরই উদ্দেশ্য থাকে মনকে উন্নত করা, বিরাটকে উপলব্ধি করা। ধরা যাক, তাদের উদ্দেশ্য ১১০° তে reach করা (পৌঁছানো)। কখনও ৯৭°, কখনও ১০৭°, কখনও বা ৮৮° ডিগ্রীতে তাদের মন ঘোরাফেরা করছে, এইভাবে চলেছে। এই যে ছক, এই যে গোলোকধাঁধাঁ, ইহা থেকে আর বেরিয়ে যেতে পারে না। আমার চোখে তো এখনও পড়ে নাই। সংযম শিক্ষা করতে করতে দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের প্রকোপ বেড়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা স্মরণ করতে করতে বুক দিয়ে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রমা করতে গিয়ে একজনের শরীরের সব ক্ষয় হয়ে গেল। মরার সময় বলে গেল, 'কেন এসেছিলাম ইহা করতে'? এসব পথে আমরা যাব না।

১০ কোটি টাকা মূল্যের একটি হীরা, আর ১০ কোটি টাকার চেক, মূল্য সমান। ১০ কোটি টাকা ছালা (বস্তা) বোঝাই করে বয়ে নিয়ে যাওয়া আমার কাজ নয়। আমরা বসে থেকে ১১০° তে যেতে চাই সহজপথে। এই জীবনই শেষ, এই ধ্যান যদি করি, ১১০° কে এমনিতেই পাই। চিত্ত বা মন শুদ্ধ হয়েই আসে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বা আবহাওয়ার দরুণ সংস্কার আমদানী হয়। সেই সংস্কার আবার ছাড়তে ছাড়তে, যেতে যেতেই সব এনার্জি নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই ১১০° তে আর reach করা (পৌঁছানো) সম্ভব হয় না। এ যেন টুল টেবিলের ঝগড়া। এগুলোকে বলে গোবর্ধন ঝগড়া। দুজনায় ভীষণ ঝগড়া। শেষ পর্যন্ত কোর্ট-এর শরণাপন্ন হতে হ'ল। কোর্ট হতে পেয়াদা, পুলিশ খোঁজ নিতে এসে দেখে, দু'জনের ব্যাগেই একটা করে কলকে। অথচ এর আগেই কাল্পনিক জমি নিয়ে ঝগড়া করেছিল, যার জন্য

পুলিশ এসেছিল।

সংস্কার বড় সাংঘাতিক জিনিস। ওল্লা গুড় খেতে খেতে পিছনের ঠ্যাং দুখানা পর্যন্ত গুড়ের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়। তারপর উঠতে যেয়ে আর তো উঠতে পারে না। গুড়ের আঠায় ঠ্যাং দুখানা খুইয়ে ফেলে। গুড় খেতে খেতেই তার মৃত্যু। যেগুলো বা উঠতে পারে, তাদের আবার বড় শত্রু হাঁড়ির মালিক। সেই মালিক তাদের পেট টিপে গুড় বের করাতে ওল্লার দফা একেবারে শেষ। আমরাও সেরূপ আটক হয়ে আছি সংস্কারে। সংস্কারের বেড়াজাল হতে মুক্ত হতে পারছি না।

মানচিত্রে ইংরেজদের রাজত্ব লাল রং-এর দেখায়। কিন্তু জায়গা খুঁজে লাল মাটি পাওয়া যায় না। তার অধিকারের প্রতীক হচ্ছে তার নিশানা অর্থাৎ Flag, যেমন আমাদের অশোকস্তম্ভ। আমাদেরও ব্রহ্মত্বের একটা ছাপের দরকার। তাহলে খুঁজতে খুঁজতে সবাই ব্রহ্মত্বের জিনিসগুলির নিশানা পাবে। যদি কেহই না পায়, তবে স্তম্ভ (নিশানা) যাদুঘরেই পড়ে থাকবে, যেমন থাকে কলকাতার যাদুঘরে।

পাপ-পুণ্য কি? মশা আমি নিজে মারি না বলে পুণ্যের বড়াই করি না। মারি না, কারণ তাহলে মশার শুঁড় শরীরে বসে যায়, আঘাতের সংঘাতে। তাতে ম্যালেরিয়া হতে পারে। মশা যাকে কামড়ায়, তার উপর শুঁড় বসায় না। কারণ তাতে তারই খোরাক নষ্ট হবে। সাপ গরুকে কামড়ায় না, কারণ তার দুধ খায়। বুঝতে পেরেছ? আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

কায়া না থাকলে ছায়া কি করে আসবে?

পাম এ্যাভিনিউ, কোলকাতা
৭ই মার্চ, ১৯৬৫

এই নাম করতে করতেই দেখবে, আপনি মন বসে যায়। মন বসাবে বা মন স্থির করবে, এরকম চিন্তা করে মন স্থির হয় না। বাচ্চা শিশু প্রথম যখন লেখা শেখে আঁকা বাঁকা হয়ে যায়। লেখার উপরই ঘষতে ঘষতে চঞ্চল শিশু সেই কলাপাতায় অ আ লিখতে লিখতে লেখা তার ধাতে আসে। ক্রমে লেখা ঠিক হয়ে যায়। তাই বলে তার মন বসে নি। মন সম্পূর্ণ চঞ্চল ছিল। ঘষতে ঘষতে অভ্যাস পাকা হয়ে যায়। এও ঠিক তাই। **স্মরণে মননে দিনরাত্র তোমাদের মনের আকুলতায় ব্যাকুলতায়, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মনেপ্রাণে যতটুকু পার, সেই সুরের ভিতর দিয়ে নাম স্মরণ কর, দেখবে, পাকা হয়ে যাচ্ছে।** এখন সবাই জিজ্ঞাসার ভিতর আছে। কি করে হয়? আমাদের একটা নাম দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বলছে, 'মন বসছে না।' বাস্তবে যত নাম আছে জানা অজানা, অগণিত বস্তুকে নাম দেওয়া যায়। প্রত্যেকটি বিষয়বস্তু টেনে নিচ্ছে, টেনে নেওয়ার জায়গায়।

বাস্তবে ছেলেপিলে, মা বাবা, ঘর সংসার কেন? যাতে আমাদের মনটা গড়ে ওঠে। মন গড়ার জন্যই এই কর্ত্তব্যের সাজে, মায়ার সাজে, ভালবাসার সাজে সংসারটা সাজানো হয়েছে, যাতে আমরা সেইভাবে গড়ে উঠতে পারি। তারজন্যই এই সংসার, বুঝতে পেরেছ? এই সংসারকে মায়া বলেছে। অনেকে সংসার ছাড়তে চেয়েছেন। ক্ষীর দিয়ে সাজে (ছাঁচে) ফেলে আম তৈরী করলে আমের মত লাগে, লিচুর ছাঁচে ফেলে লিচু করলে লিচুর মত লাগে। **এই দুনিয়াটা একটা সাজ। এই সাজে (ছাঁচে) ফেলে**

গড়ে নিতে হয়। সিদ্ধির সাজ, মুক্তির সাজ, অনুভূতির সাজ, দর্শনের সাজ, কতরকমের সাজ আছে। এই সাজে যাতে আমরা গড়ে উঠতে পারি, তারজন্যই প্রকৃতির নানা ব্যবস্থা। সত্যিকারের শোক বই পড়ে হয় না। ঘা না খেলে শোক হয় না, যেমন স্বামীর শোক, পুত্র শোক। আমার ভাই মারা গেছে, চোখের জল ফেললাম, এভাবে শোক হয় না, দুঃখ হতে পারে। আর বাবা, মা, ছেলে মারা গেলে যে ভাব হয়, তার যে শোক, সেটা সাংঘাতিক। বৈরাগ্যও তাই। বই পড়ে মুখস্থ করে সেইরূপ বৈরাগ্য হয় না। মা, বাবা কেউ থাকবে না। আমি চলে যাই, এই যে বৈরাগ্য; সিনেমা দেখে, বই পড়ে এভাবে হয় না। বৈরাগ্য হচ্ছে, প্রতিমুহূর্ত্তে মায়ামোহের বন্ধন যেমন আমাদের আবদ্ধ করেছে, আবার প্রতিমুহূর্ত্তে সেই বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। এই দুটোই বুলেট হয়ে যাচ্ছে। এই যে মাকু আছে খটখট, এই যে মাকুর টান, ওতে বিরাটের বুনিয়াদ (ভিত) তৈরী হয়ে যাচ্ছে।

আধ্যাত্মিক স্তরে কিভাবে পৌঁছানো যায়? আধ্যাত্মিক রাস্তা এই দুনিয়াটাই। সবটাই আধ্যাত্মিকের রাস্তা। কোনটা ফেলবার জিনিস নয়। যা কিছু ফেলে দাও, সবই কাজে লাগছে। এই যে থুথু বলো, যাই বলো ময়লার কারখানা হতে ধাপার মাঠে নিয়ে ফেলে দিচ্ছে। আমরা সুন্দর কপি, ভাল ভাল কপি, ভাল ভাল ফলমূল, শাকসব্জী পাচ্ছি। এই যে ভাল গ্যাস লাইট, নর্দমা (আবর্জনা) হতে তৈরী হয়। নর্দমা হতে সেন্ট তৈরী হয়। আজকাল নর্দমা (আবর্জনা) হতে মিষ্টিও (স্যাকারিন) তৈরী হচ্ছে। একজনের ত্যাজ্য, আরেক জনের ভোগ্য। একজনের ত্যাজ্য বস্তু যদি আর একজন গ্রহণ করে, কোনটাই ফেলবার নয়; সবটাই গ্রহণীয়। এই পৃথিবীর জল, বাতাস সবাই গ্রহণ করছে যখন, কেহই ফেলবার

নয়। এই ভগবানের রাস্তা, ভগবানকে পাবার রাস্তা, একটাই নয়। আমরা সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে পাহাড় পর্বতে বসলাম, এইটাই ভগবানের আরাধনার রাস্তা নয়। বহুরকম রাস্তা আছে। বহু রাস্তা আছে বলেই সব এক জায়গায় গিয়ে ঘোলাটে হয়ে যায়। কিন্তু এত সুন্দর সহজ রাস্তা, অতি মধুর রাস্তা আছে। **স্রষ্টা তাঁর নিজের কাছে নিয়ে নেওয়ার জন্য অজস্র পরিচয়ের ভিতর দিয়ে অতি সহজ রাস্তা করে রেখেছেন। তিনি চান সবাই যেন তাঁর কাছে যায়; তাঁর সঙ্গে যেন সকলের যোগাযোগ হয়।** কাজ করে যাচ্ছি ঠিকই। কিন্তু আমরা কখনও সন্দেহ করি। মনে নানারকম দ্বন্দ্ব আনি। এইসব সাজ আমাদের তৈরী করার জন্য। আজ দেখ, রাজা আছে, প্রেসিডেন্ট আছে, মন্ত্রী আছে। এক একজনের এক একটা সাজ আছে। একটা পাখী দেখ, কি সুন্দর বাসা তৈরী করে। এক একটা খড়কুটো যোগাড় করে কি চমৎকার বাসা তৈরী করে। সে কারও উপর নির্ভর করে বসে থাকে না। উড়ন্ত অবস্থায় মুখে করে, ঠোঁটে করে লতাপাতা নিয়ে এসে সে তৈরী করে তার আস্তানা। আমরা জানি, এই আস্তানায় আমরা চিরদিন থাকবো না। তবু ব্যস্ত হয়ে পড়ি, সেই আস্তানার জন্য। এই কথাটা আজকের বা এখনকার কথা নয়। এটা এসেছে ভেসে বহুদূর থেকে। তাই এই যে আস্তানার কথা, এটা এখানকার কথাতেই শেষ নয়। এই যে পাগল আস্তানার জন্য, এটা কোন্ আস্তানা? এটা সেই আস্তানা যাতে প্রকৃতির সুরে মিলন হতে পারে; তারই ধাপ এই সিঁড়ি। আমরা একতলা করি, দোতলা করি, তারপর চাই একটু শান্তি। পরমানন্দ, চিদানন্দ, ব্রহ্মানন্দের কথা শুনা যায়, এটা তারই একটা বাণী। তারই কথা ভেসে আসছে কোথা হতে খেয়াল নাই? **উন্মাদনার উন্মত্ততায় আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ছি একটু শান্তির জন্য। সমস্ত জীবলোক ঝাঁপিয়ে পড়ছে একটু**

আস্তানা চাই, শান্তি চাই, মুক্তি চাই নিজের ঘরের কয়েকজনার জন্য। স্ত্রীকে বাবা মাকে শান্তি দিতে চাই।

এই শান্তি আজকের কথা নয়। কস্তুরীমৃগ তার নাভীর গন্ধ টের পায়। এমন সুন্দর গন্ধ কোথা থেকে আসছে? সে পাগলের মত ছুটছে। কি মধুর গন্ধ, কোথায় কোথায়? তারই মধ্যে রয়েছে কিন্তু কোথায় কোথায় করছে। আমাদের মধ্যেও সেইরূপ মৃগনাভীর ন্যায় পরমানন্দের বাণী, চিদানন্দের কথা, আস্তানার কথা, সাধনার কথা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। আমরা বুঝতে পারছি না। **মানুষ শুধু চায় একটু শান্তি, একটু সুখসুবিধা। কিভাবে শান্তি হয় তারই চেষ্টা করে চলেছে। বিলেত গেল, আমেরিকায় গেল, কি কারণে গেল? কেবলই শান্তি চাইছে। কিন্তু খুঁজে আর পায় না।** তারই ভিতরে রয়েছে যখন বুঝতে পারবে, তখনই হবে সমস্যার সমাধান। তবে কায়া না থাকলে ছায়া কি করে আসবে? বিরাট কায়া (শান্তি) সেখানে রয়েছে যখন জানতে পারবে, তখনই বুঝবে এই জায়গাটা, এই শান্তির আকাঙ্খাটা কোথা থেকে এল? সেখানকার সেই গুরুগম্ভীর ধ্বনি এখানে এসে স্পন্দিত হচ্ছে। সাগরের ঢেউয়ে কেঁপে ওঠে, ভূমিকম্পে যেমন কেঁপে ওঠে, সেইরূপ সেখানকার গুরু নিনাদের ধ্বনি, সেখানকার যে শঙ্খধ্বনির সুর, সেখানকার যে অবিরাম ঢেউ, সেখানকার যে কলকলধ্বনি, সেই ধ্বনির যে স্পন্দন কোত্থেকে আসছে আমরা বুঝতে পারছি না, তবুও আসছে। বাস্তবে সংসারজীবনে সুখশান্তি আনবার জন্য তোমরা সাধনা করে যাচ্ছ; প্রকারান্তরে তোমরা করতে বাধ্য হচ্ছ। বাচ্চা বলছে, 'খেতে দাও।' পিতা ছুটছে, ওর পেটে যদি একটু দিতে পারি। পেট ভরার যে চিন্তা, এই ভরার চিন্তায়, তৃপ্তির চিন্তায় আমরা

এগিয়ে যাচ্ছি। এটাই পরমানন্দের কথা, পরমতৃপ্তির কথা। এটা আপনি স্ফূরণ হয়ে যাচ্ছে। সেই মহাধ্বনির মহামূল্যবান বস্তু যে রয়েছে এখানে, সেখান হতে খনন করে যদি নেই, আরও বেশী পাব, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। 'এই যে এত করলাম। মা চলে গেছে। বাবা চলে গেছে।' শুধুই আফশোস। যে মারা গেল, সে তো আর ফিরলো না। গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি, বিষ্ণুর পাদপদ্মে পিণ্ডি দিয়ে এল।

বিষ্ণু করেছেন কি, **বিষ্ণু সংসারের কল্যাণের জন্য, মুক্তির জন্য পাথরের উপর পদচিহ্ন রেখে দিয়েছেন। ভক্ত বিষ্ণুর দর্শন লাভ করে বলছে, 'হে ভগবান, আমি তো তোমার দর্শন পেলাম কিন্তু জীবের কল্যাণ কি করে হবে? মুক্তি কি করে হবে?'**

বিষ্ণু এসে পদছাপ দিলেন। বিষ্ণু কি করলেন? ভক্তের ভিতর দিয়ে প্রত্যেকেই যাতে মুক্তির পথের পথিক হতে পারে, এটাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন। তাই তিনি পদছাপ দিলেন। পাথরে পদচিহ্ন রয়ে গেল। এই মুক্তির পথে যাতে এগিয়ে যেতে পারি, তারজন্য তাঁর (বিষ্ণুর) পায়ের যে ছাপ, সেটা শুধু এক জায়গায় নয়, বিশ্বের সর্বত্র সর্বজায়গায় স্রষ্টার চিহ্ন রয়েছে। এতবড় পৃথিবী, এতবড় হিমালয়, সাগর, সূর্য— সেখানে শুধু পদের পদছাপই বড় কথা নয়। সর্বত্র সবাই পাহাড়, পর্বত ধ্যানে অটল হয়ে রয়েছে; দাঁড়ি, কমা সর্বত্র একই সুর, একই ধ্বনি। সাগর উথাল-পাথাল করছে। এই যে অবস্থাগুলো, সূর্য দাউ দাউ করে জ্বলছে। এই ছাপ কার? বিষ্ণুর। এই যে গায়ত্রী মন্ত্র শাস্ত্রগত কেবল ব্রাহ্মণের জন্য ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ... সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে গায়ত্রী মন্ত্র, সেটি হল ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য

ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওম্। বসে বসে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছো। দেখবে, চার হাত গায়ত্রী এসে হাজির হলো। এই মন্ত্রটা অহর্নিশ জপ করলে গায়ত্রী সামনে এসে বলবে, 'তুমি আরও কাজ করে যাও।' এই যে রূপ সামনে আছে আমাদের, এটাই আমাদের স্বরূপ। এই চিহ্ন, এই ছাপ এমনভাবে রয়েছে, আমরা যদি প্রতিদিন চিন্তা করি, আমরা বিষ্ণু, মহাদেব, নারায়ণের কাছে পৌঁছাতে পারি। এত সহজ রাস্তা রয়েছে আমাদের। **ভগবানের রাস্তা সবচেয়ে সহজ। আজ সেটা কঠিন বলে মনে করছে, 'পাপী তাপী, আমাদের কি হবে?' যাঁর কাছে কোন হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, নীতির কোন বিবাদ নেই। সকলের সম অধিকার রয়েছে যেখানে, তাঁর দ্বার সর্বত্র সকলের জন্য।** এই যে মহাপ্রভু দিবারাত্র দুই বাহু তুলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সমানে করে চললেন, বিষ্ণু জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে। রাস্তায় ঘাটে শুধু এই নাম। ঘরের ছাউনি দিতেন, মাটিও দিতেন, ঘরও মুছতেন। আর এই নাম, এই ১৬ নাম ৩২ অক্ষর তিনি দিনরাত করতে আরম্ভ করলেন। দেখা গেল, বিষ্ণু চারিদিক হতে বলছেন, 'তুমি কেন ডাকছো?' বিষ্ণু তাঁকে (মহাপ্রভুকে) জড়িয়ে ধরে দেখিয়ে দিলেন, 'তুমি আর আমি এক।' এইজন্যই এই কথাটা হয়েছে, ''হরি হয়ে হরি ভজে গৌর নিত্যানন্দ।'' এই একই বস্তু সকলের ভিতর আছে। অতি সহজ বুদ্ধি দ্বারা আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি।

এই যে এক হয়ে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে, সবাই এক হয়েই আছে। আবার এখানে নাই। একের মধ্যেই এসেছে বিবাদ। এই যে নিয়মগুলো, এত খাওয়া-খাওয়ি, মারামারি, বিচ্ছেদ কেন? নিজেদের গড়বার জন্য এটাই দর্পণ। পূজার সময় দর্পণ দেখায় না? গড়বার জন্য। এই ভূর্লোক, ভুবঃলোক, তপো লোক,

মহালোক, জনলোক, সত্যলোক, বিরাট দর্পণস্বরূপ আমাদের সম্মুখে রয়েছে। এই অনাহতে মহাপদ্ম। তিনি সমগ্র জগৎকে মহা সুরে ডুবিয়ে রেখেছেন। তার মধ্যে ডুবে থেকেও আমরা 'কোথায় কোথায়' বলে ব্যথা পাচ্ছি। তিনি অনাহতে বুক চিরে সুরের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই অনাহতে মহাপদ্ম আর মণিপুরে মহাপদ্ম। এই দুই সুর এক করে রেখেছে এখানে। স্রষ্টা চান না বারবার এই নরকের ভোগ হয়। এই মূলাধার হতে সহস্রারের ভিতর দিয়ে যাতে সেই সুরকে খুঁজে পাওয়া যায়, তারজন্যই এই সপ্তচক্র। তবুও আমরা কি করছি? **বারবার যাতে জন্ম হয়, তাই করছি। স্রষ্টা তা চান না। স্রষ্টা চান মুক্তির পথে আমার সেই মহাপদ্মের ভিতর সবাই সুর খুঁজে পাক, যাতে জন্মের পর জন্মের এই ঘূর্ণীপাকটা নষ্ট হয়ে যায়।** আর আমাদের যাতে আবার জন্ম হয়, সেইদিকেই লালসা যায়। আমরা সেটাই ধরে বসে আছি। ঘুরে ঘুরে সেটারই চেষ্টা করছি। আমাদের পথ যদি সুগম না হয়, আমরা যদি তাঁকে (স্রষ্টাকে) জানতে চেষ্টা না করি, তাতে আমাদের অসুবিধা হয়ে যাবে।

স্রষ্টা তোমাকে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন। স্রষ্টা নিজে দান করেছেন তাঁর ইচ্ছাশক্তি। যার যার ইচ্ছাশক্তি প্রত্যেকের মধ্যে আছে। তোমার ভিতর অনন্ত সন্তান আছে। তুমি যদি বীর্যপাত না কর, তোমার মধ্যে অগণিত সন্তানকে রক্ষা করতে পার। তুমি যদি বিবাহ না কর, তাহলে কি করে সন্তান হবে? একজন যদি ১ হাজার বিয়ে করে, তার ৪ হাজার বাচ্চা হতে পারে। কত কোটি সন্তান তোমার মধ্যে আছে। ব্যবহার না করলে আটকিয়ে রাখতে পার। আমার বাচ্চা বাপকে জেলে পুরে দিল। আবার তোমারই বীর্যে তোমারই বাচ্চা কসাইয়ের মত কাটতে পারে। তোমাকে জেলের ভিতর ঠেলে দিতে পারে। সন্তান ভিতরে

থাকলে এক কথা। আর বাইরে থাকলে, যা ইচ্ছে করতে পারে। ভালোও করতে পারে, ভালো নাও করতে পারে। **স্রষ্টা আমাদিগকে যখন বার করলেন, প্রত্যেকের ভিতর বিরাট ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে দিলেন। এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব প্রতিবস্তুর ভিতরে আছে। তিনি (স্রষ্টা) তার উপর সেই ইচ্ছাশক্তির উপর, কখনও হস্তক্ষেপ করবেন না।** কাজেই তোমরা ইচ্ছা করলে স্বর্গেও যেতে পার, নরকেও যেতে পার, এই বলে তিনি সহি (সই) করে দিলেন। আমিও সহি (সই) করে দিলাম। আমি তো সই করে ফাঁসলাম। স্রষ্টা তিনি একখানা দলিল তৈরী করলেন তাতে সহি করে দিলেন, 'তুমি ইচ্ছামত স্বর্গে আসতে পারো। আবার নরকেও যেতে পার।' আমরা ইচ্ছামতো যা ইচ্ছা তাই করি। ইচ্ছামতন পকেট কাটি, হৈহুল্লোড় করি। ভগবান দেখলেন, আমি তো সহি করে ফেঁসেছি। ভগবান ভাবছেন, 'হায় হায় কি করলাম।' কারণ আমরা এমনই বেলাইন করলাম, ''বড়বাজারে চাউল জমাও। এত চাল কি করা যায়? জমাট করে নদীতে ফেলে দাও। দাম বাড়াও। **মানুষকে আটকাও। মানুষকে জব্দ কর। র‍্যাশন কর; যাতে মানুষ আর সময় না পায় পলিটিক্‌স্ বা রাজনীতি করার। কেউ যাতে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু করতে না পারে। সকালবেলায় র‍্যাশন আনো। র‍্যাশন এনেই অফিস, অফিস থেকে এসেই কয়লার লাইন। কোন আলোচনাই আর চলবে না। অন্যায় করবো, অবিচার করবো, র‍্যাশন সিস্টেম করবো, তোমাদের (জনগণের) মুখ বন্ধ করার জন্য।**'' যে দেশে খাওয়া জোটে না, সে দেশে র‍্যাশন চলে না। সে দেশে কি হবে? আমেরিকার সব গ্রামই সহরের মতন।

আমি সহি করে দিলাম। শৈলবালার ছেলেদের জমি দিলাম, টাকা দিলাম। ওরা মনে করলো, 'ব্যাটারে পাইছি।' দিল

ঠুকে। জেল দিয়েছিল, 'একবছর আটকাও'। মিথ্যা মামলা টেকেনি। আমি হাইকোর্টে সসম্মানে জয়লাভ করেছি। নাহলে লোকে মনে করতো, 'এনাকে ভগবান বলি। ইনি এই কাজ করেছেন।' তোমাদের যা কিছু খেলা এই ৬০/৬৫ বছর পর্যন্ত। শেষরাত্রে বলছে, 'মা মাগো, বাবা চলে যাচ্ছে।' কত ব্ল্যাক মার্কেটিং করে, কত কি করে দশতলা বাড়ী করলো। আর শেষবেলায় তিন টাকার খাটুলি (খাট) আনছে। **খেলা কে খেলে? নাচতে নাচতে যদি স্বর্গে যাওয়া যায়, সেই নাচই নাচো। আর যেই খেলায় নাচতে নাচতে শেষবেলায় ওঃ ওঃ ব্যাস্। সেই খেলা খেলে লাভ কি?** আমরা চোখের সামনে দেখছি। এমন একটি দৃষ্টান্ত (মৃত্যু) চোখের সামনে দেখেও কিন্তু তারপরই আবার চিন্তা করছে, ঘরবাড়ীর কথা, মেয়ের বিয়া কি করে দেবে। এটা ছোঁয়াচে রোগ। ছোঁয়াচে রোগ বড় রোগ।

একমাত্র সুরের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে বিরাট পথের পথিক হওয়া যায়। সেই পথের পথিক যখন আমরা, আমাদের মধ্যে অগণিত সন্তান আছে যখন, তুমি যদি একবার হরেকৃষ্ণ হরেরাম বল, তোমার ভিতরে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুপরমাণুগুলো আছে, তারাও সেই নাম বলবে। দেখ কত কোটি হয়ে গেল। সাথে সাথে দেহবীণাযন্ত্রের সমস্ত তারগুলো ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে। সেই সমস্ত সন্তান হলো যার যার ভিতরের। **আমি হরেকৃষ্ণ হরেরাম বলে চিৎকার করবো, আর একসাথে ভিতরকার সেই অজস্র সন্তানগুলোও হরেকৃষ্ণ হরেরাম বলে চিৎকার করবে। তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে একবার নাম উচ্চারণ করলে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নাম একবারে হয়ে যাবে। যদি তুমি এটা মনেপ্রাণে গেঁথে নিতে পার, প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার ভিতরে লক্ষ**

কোটি নাম জেগে উঠবে। এভাবে দিনের পর দিন যদি করতে পার, তোমার ভিতরে জেগে উঠবে শঙ্খ নিনাদের সুর। মুক্তির পথে মহানিনাদের শঙ্খনিনাদ বেজে উঠবে। তোমার ভিতরকার সন্তানেরা একই সুরে সুর দেবে।

তোমরা বিরাটের পথের পথিক। ভিতরকার সন্তানদের উদ্দেশ্যে বলো, ''হে সন্তানগণ, কোটি কোটি সন্তান যারা আমার ভিতরে বিরাজ করছো, পিতার সন্তান হিসাবে বিষ্ণু পদে পিণ্ড দিয়ে (নামের মাধ্যমে) **মুক্তির পথে তোমরা আমায় সাহায্য করো।** সজীবতার সাড়া পাই এই জগতে তোমাদের মধ্যে। কাজেই তোমরা পিতাকে সাহায্য করো। তোমরা পিতাকে মুক্ত করো।''

প্রত্যেকের ভিতর কোটি কোটি সন্তান আছে। তুমি মহাপ্রভুর সেই নাম ১৬ নাম ৩২ অক্ষর বা **যে নাম তোমাদের দেওয়া হয়েছে, সেই মহানাম উচ্চারণ করো। একবারে লক্ষ কোটি নাম হয়ে যাবে। ভগবানের ভগবত্তা তোমার মধ্যে আশীর্বাদ স্বরূপ বর্ষণ হবে।** তোমার সাথে সহস্রারে সঙ্গম হবে, চির মিলনে মিলিত হবে। মহাপ্রভুর নিকট বিষ্ণু যখন এলেন, তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। তোমরা তাঁরই পথের পথিক। অগণিত লক্ষ কোটি তারের মাধ্যমে জানিয়ে দাও তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে ভিতরের সন্তানদের কথা। লক্ষ কোটি সন্তান তোমার ভিতরে রয়েছে এবং আকুলপ্রাণে বল, 'হে সন্তানগণ, তোমরা পিতাকে সাহায্য করো।' তোমরা শুনতে না পেলেও বুঝতে না পারলেও কাজ হবে। তাতেই ভগবান সুপ্রসন্ন হবেন। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

তোমরা মুক্তির পথের পথিক
তোমাদের কেহ আটকাতে পারবে না

১৫৫, পার্ক ষ্ট্রীট, কলকাতা
২০শে মে, ১৯৬৮

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা ও সহস্রারে কর রাম নাম। ঋষি বলছেন, দেখ, 'কিছুই করবো না, কিছুই বলবো না; এই একটি পথ। আমি কিছুই করবো না, কিছুই বলবো না। এখানেই আমার শেষ কথা।' এই কথাই যখন শেষ কথা হবে, তখন কিছুই করবো না, কিছুই বলবো না। জীবনের চলার পথে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই পালন করবো, এই কথাই যখন বহাল হবে, এটাই মুক্তির কথা।

মুক্তির কথা অনেক রকম আছে। কিছুই নেই, কিছুই করার নেই। একথা যখন অন্তরের অন্তর্নিহিত কথা হবে যে, 'আমি কিছুই করবো না, কিছুই বলবো না।' অন্তর্নিহিত বাণী হিসাবে যখন ফুটে বের হবে, সেটাই মুক্তির কথা। মুক্তির বাণী আবার আছে, 'আমি কোন কিছুই মানি না। আমার কিছু করার দরকার নেই।' এটা লোক দেখানো কথা। আবার 'আমি সেই নামে বিভোর হয়ে থাকবো। আমার সমস্ত সত্তা আকাশের সাথে মিশিয়ে দিয়ে বর্ণে বর্ণে তোমার নাম আমি করবো।' এটাও মুক্তির কথা। কোন্‌টা চাও? সুরের সাথে সুর মিলিয়ে এটাই হল প্রকৃত চাওয়া। কোন দলীয় স্বার্থে কোন কিছুই করবো না। কিছুই মানি না। একথা বেশীক্ষণ থাকে না। এটা তার অন্তরের কথা নয়। তাই এটা স্থায়ী হয় না। যখন আঘাত আসে, জর্জরিত করে ফেলে, একথা আর তখন থাকে না। আমরা 'মানি' হিসাবে যদি

পেয়ে যাই, তাও ভাল। আবার 'মানি না' হিসাবে যদি পেয়ে যাই তাও ভাল। **আমাদের কাজ, আমাদের পথ অতি সুন্দর। যখন জানতে পারলে 'কিছুই মানি না। কিছুই পারবো না। এই জীবনই আমার শেষ জীবন।' এই কথা যে সত্যিকারের বলতে পারবে, অন্তর থেকে বলতে পারবে, সে মুক্তিরই কথা বলে। সে মুক্ত।** যারা বলে, আমরা মানি, আমাদের কাজ নিয়ে এই জীবনের পথে অগ্রসর হবো। এই জীবনই শেষ জীবন; যারা নিজেকে সঁপে দিয়েছে, তাদের কাজ স্বচ্ছ, তাদের গতি স্বচ্ছ, তাদের মনপ্রাণ স্বচ্ছ থাকবে। তাদের গতি স্রোতস্বিনীর ধারার মত বয়ে যাবে। তাদের স্বচ্ছ ভাবে তারা সতত এই চিন্তায় রত, 'আমরা অনন্ত পথের পথিক, যাত্রিক।'

আর একটা ভাব আছে। যদি আসে ভাল, না যদি থাকে তাহলেও ভাল। **তোমরা যাচ্ছ সেই পথে। তোমরা মুক্তির পথে যাচ্ছ। তোমরা সেই পথের পথিক। তোমরা নাম করে যাচ্ছ। যদি রাম থাকেন, শিব থাকেন, তোমাদের কাছে ধরা দেবেন।** যদি না থাকেন, না এলে কোন কাজ নেই। তোমাদের বাসনা নেই, আকাঙ্খা নেই। শুধু কাজের উন্মাদনা আছে। এই আঁকা (জগৎ) ও ফাঁকার (মহাশূন্যের) কথা জানার যন্ত্রে জানতে জানতে অগ্রসর হতে হচ্ছে। তোমরা পথিক হয়ে জানার জন্য এগিয়ে যাচ্ছ। **তোমরা জানার পথের পথিক, মুক্তির পথের পথিক। তোমরা মৃদঙ্গের তালে করতালিতে নামের মাধ্যমে চলছো। যদি থাকে ভাল, 'এই মহানামের ধ্বনি বাজাতে বাজাতে মহাচৈতন্যে নিজেকে লীন করে দেব; আমিও তার সাথের সাথী। আমিও শূন্যে মিশে যাব।'** এইভাবে তোমরা অগ্রসর হয়ে যাবে। মহাকাশের মহাশূন্যে সেখানে আছে অনন্ত সূর্য। অগণিত গ্রহ,

উপগ্রহ রয়েছে সেখানে, যারা শূন্যমার্গে চেয়ে আছে দিনের পর দিন। এরা সূর্যের মত ঘূর্ণিপাকে নিজেদের কক্ষে ঘুরছে। কেন ঘুরছে? কিসের প্রয়োজনে? তারা যদি ঘুরে ঘুরে কোন প্রয়োজন মিটাতে পারে, আমরাও পারবো। **আমরাও অনন্ত মহাকাশে মহাশূন্যের পথিক হয়ে রয়েছি। আমাদের মনও চন্দ্র সূর্যের মতন মহাশূন্যে ঘুরছে। পূরণের সুরে পূর্ণ করতে চাইছি।** পূরণ যদি হয় হবে, না যদি হয়, তবেও আচ্ছা (ঠিক আছে)। **আমাদের স্বচ্ছ গতিতে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। ধু ধু করে অনন্ত পথ। আলোর গতিতে আলোর পথের পথিক হয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।** আমরা নাম করবো, আমরা ডুগডুগি বাজাবো। বাতাসের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব রয়েছে। জলের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব রয়েছে। বাতাস, আলো, জলের সমন্বয়ে গঠিত আমরা। বাতাস কিভাবে বার্তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে অনন্ত মহাকাশে। আলো নিয়ে যাচ্ছে আলোর সাথে, জল নিয়ে যাচ্ছে প্রতি অণুপরমাণুতে এবং সমস্ত সত্তায় জানিয়ে দিচ্ছে। সচেতন বস্তুর সাথে যোগাযোগ সূত্রের ধারা ধরে ধরে আমাদের ধারা অনুযায়ী এরা আমাদের সাথে করে অগ্রসর হচ্ছে মহাশূন্যে অদ্ভুত অদ্ভুত হয়ে।

আমরা দর্শন করছি, শ্রবণ করছি। সমস্ত জগতের সাথে দর্শনের সঙ্গে মিশে, শ্রবণের সঙ্গে মিশে নামের মাধ্যমে, আঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে আমাদের রোগ, শোক, দুঃখ-দারিদ্র্যের বার্তা পৌঁছাচ্ছে আকাশে। **সর্বজাতি, সর্বলোক তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সেই আকাশের আকার নেই। আবার আকাশ হতেই ইকার আকার নিয়ে জীবজগৎ সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা তাঁরই সৃষ্ট বস্তু। আমাদের বার্ত্তা আকাশের মাঝে অসার হয়ে আছে। আমাদের মধ্যে জেগে উঠবে অনন্ত মহাশক্তি; জাগবে**

অনিবার্যভাবে। জাগার জন্যই সৃষ্টি। এক সময়ে আমি যখন বসতাম কিছু কাজ করবার জন্য, তখন সকলের মনে গাঁথলাম সেরূপ। তারপর বলি, থাকলেও 'আচ্ছা', না থাকলেও 'আচ্ছা'। তখন দেখি একটু অগ্রসর হলো। তারপর বলি, কিছুটা কাজ কর। তোমরা যা হতে সৃষ্ট হয়েছ, সেই সূর্যের রূপের সাধনা কর। রূপের সাধনা করলে তেজের সাধনা করা হয়। তেজের সাধনা করলে আলোর সাধনা করা হয়।

আর সময় নেই। দিন চলে যাচ্ছে। কর্ত্তব্যের ত্রুটি করো না। শুধু নাম কর। এই নামের মাধ্যমে জেগে উঠবে, বেজে উঠবে সপ্ত সুরের ঝঙ্কার। তোমরা মুক্তির পথের পথিক। তোমাদের কেহ আটকাতে পারবে না। তোমাদের ধারা আছে, সহজ পথ। তোমাদের অন্তরায় থাকবে না। সাময়িক রোগ, শোক ছাড়া তোমরা অনিবার্যভাবে সফল হবে। কারণ শিশুবয়স হতে আমি খনির কর্মী। কাজেই এই খনির কাজই করি। আমি সেই দিকেই নিয়ে যাব। শুধু নিষ্ঠাসহকারে নাম করো। আর বেশী বললাম না। আজ এই থাক। যাহা শাস্ত্রে মীমাংসা হয়নি, আমি তাহাই বলে যাব। আকাশ হতে কি করে সৃষ্টি হল, কে কোথায় ছিল, কেমন করে এলো, জলের মতন পরিষ্কার। লেখনীর মাধ্যমে তোমাদের দিয়ে যাব।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) বীরেন্দ্র দর্শন, জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোল-৫, ফোন- ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) তাপস সেনগুপ্ত, নিউজলপাইগুড়ি, মোঃ - ৯১৫৩৮০৮১৭২
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১০) বলরাম, ৩৪ এস.কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮, মোঃ- ৯৮৩৬৬৯৯৪৪৮
১১) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১২) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৩) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৪) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৫) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৬) মধুসূদন মৈত্র পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৮৩১৬১১৬৮৪
১৭) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২১) বালক ব্রহ্মচারী যোগ মন্দির, লিলুয়া, হাওড়া, ফোন - ৯২৩০৯১৩৬৫৫
২২) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২৩) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৬) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
২৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কোচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
২৮) নিহার / অচিন, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ৯৪৭৪১৪০২৫২
২৯) আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, ফোন - ২৪৪০-৯১৫১
৩০) ডঃ সুধাংশু দত্ত, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ফোন - ০৯৪৩৫১৯০৭৮১
৩১) হুগলী জেলা সন্তান দল কার্য্যালয়, ১ সারদাপল্লি, শেওড়াফুলি, মোঃ- ৮১০০৪৩৯৯১১
৩২) ভগীরথ সাহা (ভগু), গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার, মোঃ- ০৯২৩৩২৩৭৬৬৬
৩৩) বেদধাম, ইছাপুর, উঃ ২৪-পরগণা, মোঃ- ০৯৪৩৩৯৫৯১৩৮

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	প্রকাশকাল
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪) চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫) মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬) সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭) লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮) বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯) যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০) ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
৩১) আলোর পথিক	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭
৩২) নাদ ব্রহ্ম	শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭
৩৩) বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭
৩৪) চিন্তন	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১০
৩৫) মহা জাগরণ	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৭
৩৬) পাপ পুণ্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৮
৩৭) মুক্তির পথ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৮

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫